প্রথম সংস্করণ

—দু' টাকা—

মিত্রালয় ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা হইতে জি, ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন হইতে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

আমার না-দেখা প্রেরণাগুরু

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রকে

তথাগত

[যিনি বিরাট, ক্ষুদ্রের স্পর্দ্ধাকে তিনি
চিরদিনই ক্ষমা করে থাকেন।]

ঘন ঘোর বর্ষায়,
চিকুরের ভর্সায়,
    মন মোর সুদূরের যাত্রী।
দুর্ব্বার বন্যায়,
প্রলয়ের ঝঞ্ঝায়,
    আজি মোর অভিসার রাত্রি।

সুরু হওয়ার আগে প্রত্যেক কাজেরই নিজস্ব একটা ইতিহাস থাকে যেটা সাধারণ্যে প্রকাশ না করলে প্রারব্ধ কাজটাকে খাপছাড়া মনে হয়।

সাহিত্যক্ষেত্রে আমার প্রবেশের এই প্রয়াসকে যদি কেউ অনধিকার প্রবেশের মর্য্যাদা দেন তাহ'লেই আমার উপর সুবিচার করা হবে। অনধিকারকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আমি নিতাম না। নিজের খেয়ালখুশীমতো অনধিকার সাহিত্যচর্চ্চা নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু ভিন্ন লোকে তাঁদের রুচি নিয়ে এলেন। যাঁদের স্নেহ এবং আগ্রহ এড়াতে না পেরে এই বইয়ের প্রকাশ হচ্ছে তাঁদের কথা বলাই এর সুরুর ইতিহাস।

আমার মাষ্টারমশাই এবং অগ্রজপ্রতিম বন্ধু শ্রীবিজয় গুপ্ত এ বইয়ের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি একত্র গ্রথিত করে প্রেসে দেওয়ার উপযুক্ত করে দিয়েছেন এবং শত বাধা সত্ত্বেও যে এ বই বেরুল সেটা তাঁরই একান্ত আগ্রহের ফল।

প্রেসের কাজের জন্য যাঁর স্নেহ-বিজড়িত শুভ ইচ্ছা এর সংগে জড়িয়ে আছে সেই পূজ্যপাদ শ্রীকালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের নাম শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করছি এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় সুরসিক ও সুসাহিত্যিক শ্রীগৌরীশংকর ভট্টাচার্য্যের সাহচর্য্য যে লাভ করতে পেরেছি এই বই প্রকাশনার কাজে, তার জন্যে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি।

আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করছি সমস্ত অন্তর দিয়ে, যাঁর সত্যিকারের শুভ ইচ্ছা এবং আগ্রহ এই বইয়ের প্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছিলেন বলেই স্থানে

স্থানে এর পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন করেছি। ক্ষুদ্র এই লেখাব জন্য তাঁর অমূল্য সময়ের কিয়দংশ যে আমার জন্য ব্যয় করেছেন তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ বইলাম।

বন্ধুত্বের নিদর্শনে যে শিল্পীবন্ধু সুবোধ গুপ্ত এই বইয়ের প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন তাঁর কথা স্মরণ না করেই পারছি না।

পরিশেষে আমার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এই বই-এর ভূমিকা লিখে দিয়েছেন ব'লে নিজেকে ধন্য এবং কৃতার্থ মনে করছি।

ভূমিকা

প্রচক্র নূতন লেখকের গল্পের বই। আজকাল সাহিত্যের বাজারে ছোটগল্প লেখকের সংখ্যাই বেশি—ছোটগল্পটাই বাঙালী লেখকের হাতে সহজে আসে। তার কারণ ছোট গল্প লিরিক-জাতীয় রচনা। কালের পরিবর্ত্তনে লিরিক ছোট গল্পের আকার লইয়াছে। বর্ত্তমান লেখক কালের রীতি অনুসরণ করিয়া ছোট গল্প লিখিয়াই সাহিত্য-জীবন আরম্ভ করিয়াছেন।

আজকাল সাহিত্যিকের সম্মুখে দুটা পথ আছে—গণ সাহিত্যের পথ আর গণ্য-সাহিত্যের পথ। লেখক যে কোনটি অবলম্বন করিবেন এখনো স্পষ্ট বোঝা না গেলেও—বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার লিখিবার হাত আছে। এটা অল্প প্রশংসার বিষয় নয়—যেহেতু অধিকাংশ লেখক লিখিতে জানে না—অথচ লেখক বলিয়া সমাজে চলিয়া যাইতেছে। এখানেই সমস্যা। এখনও এমন কোন সহজ পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই যাহাতে ঝুটা হইতে সাঁচ্চা বাছিয়া লওয়া যায়। সংখ্যাধিক্যের উপরেই এ যুগের আস্থা। কিন্তু সমাজে অধিকাংশ লোক নির্ব্বোধ ও মূর্খ বলিয়া ঝুটার আদর হওয়াই স্বাভাবিক, হইয়াও থাকে তাই। অধিকাংশের প্রশংসা পাইবার ইচ্ছা হইতে লেখকের দূরে থাকা আবশ্যক। নূতন লেখকের পক্ষে তাহা সহজ নয়—পুরাতন লেখকের পক্ষেও কঠিন। তথাগত যদি অধিকাংশের প্রশংসা হইতে দূরে থাকিয়া সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া যান, তবে শেষপর্য্যন্ত স্বল্পসংখ্যক কৃতী ব্যক্তির প্রশংসা অর্জন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। এই পথটাই গণ্য-সাহিত্যের পথ। অন্য পথটার পরিচয় দান বাহুল্য—যেহেতু সেটাই আজ বাংলা সাহিত্যের বড়বাজারের পথ। সাহিত্যের চোরাবাজার ও

বড়বাজার দুটাই পরিত্যাজ্য—এ কথাটাও নূতন লেখকদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। এই সব পরামর্শ মনে রাখিতে পারিলে লেখক একদিন হয়তো সাহিত্যের তথাগত হইতে পারিবেন।

৩. ৯. ৪৯ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

প্রচক্র

ক্লান্ত পথিক থামে।
চেয়ে দেখে—
এগিয়ে চ'লেছে, এক বিদ্রোহী সেনা।
বন্দী আজ মুক্ত।
আজ সে ছিঁড়ে ফেলেছে নিষেধের বেড়ী,
অমান্যের শক্তি দিয়ে।
মাথার উপর তুলে ধ'রেছে—
অসংযমের নিশান।
সে চলেছে।

সমস্ত বাংলা, আজ
কালো সাপের নীল বিষে—
মৃত্যু শয্যায়।
তাকে বাঁচাতে হবে,
জাগাতে হবে।
বিষ-জিহ্বা শাসন "ভ্যাম্পায়ারকে"
হটাতে হবে।
সৈনিকের হাতে গর্জ্জে ওঠে,
লেখনী বজ্র।

পথিক ভাবে—
যদি ঝড় আসে ?

সৈন্য থেমে যায় ;
সেও বুঝতে পারে।
হাতে বাগিয়ে ধরে
নব-সৃষ্টির "ডিনামাইট"।
পাহাড় কেটে পথ তৈরী ক'রবে সে।
সৈন্য আবার চলে।
সে থাম্‌বে না।
যত বাধাই আসুক
"শ্রাগ্‌" করে সব কিছুই ফেলে দেবে।
তাকে এগুতেই হবে।
"মাভৈঃ"—
গর্জ্জে ওঠে সেনা।

* * *

ওধার থেকে, বান ছুটে আসে
প্রতিরোধের শক্তি নিয়ে।
অবরোধের বর্মে লেগে
খসে পড়ে—
সৈনিকের পায়ের নীচে।
সৈনিক হাসে।
আবার তীর আসে—

পুরাতন অন্ধকারের বিষ মাখানো
সংস্কার নিয়ে।
সৈনিক বাগিয়ে ধরে,
নূতনের ঢাল !
বার বার ব্যর্থ হ'য়ে,
তীর ফেরে ।

সৈন্য অটল।

পথিক দেখে—
এইবার সৈনিকের পালা ।
ঝলমল অস্ত্রের আভায়
মুখ তার লাল হয়ে ওঠে ।
সৈনিক ছুঁড়ে মারে—
কৃষ্টি-বহ্নির বোমা ।
ধোঁয়ায় হারিয়ে যায় ওদিক ।
সৈনিক পাশ কাটায় ;
অন্ধকারে জ্বেলে দেয়
নবাগ্নির দীপ !
পথিক চেঁচিয়ে ওঠে "জয় নবাগ্নির" ।

জানালার গরাদগুলো

১

অদ্ভুত ছেলে এই মণি দা' (আমার এক দূর সম্পর্কীয় জ্যেঠামশাইর ছেলে)—দশ বছরেও ওকে চিন্‌তে পারলাম না। ছোটবেলা থেকে খেলা করতে করতে এক সঙ্গেই ছ্'জনে বেড়ে উঠেছি, তবু ও মাঝে মাঝে মনে হয়, ওর সঙ্গে যেন নতুন আলাপ। ওর মনের ভাব এখনো পর্য্যন্ত ঠিক বুঝতে পারি না। একটা বিরাট সংসারের মধ্যে ঝড় ঝাপ্‌টায় মানুষ ও। সেই ঝড়-ঝাপটার মধ্যেই পথ হারিয়ে হঠাৎ একদিন দেখা আমার সঙ্গে। সেই থেকেই ছ্'জনের মনের কোণ ধীরে ধীরে ছ্'জনে দখল করতে লেগেছি। আমাদের সেই বন্ধুত্ব এখন দশবছরে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তবুও মণিদা'কে ভালো ক'রে চিন্‌তে পারি নি। এখনো ভুল হয়, বুঝতে পারি না যে আমি তাকে ধরতে পারিনি, না সে আমায় ধরা দেয় নি।

ছ্'জনেরই কর্ম্মক্ষেত্র আলাদা। তাই কিছুদিন হ'ল ছ্'জনকেই কর্ম্মক্ষেত্রের জন্যে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। মণিদা'কে এখন কাজের জন্যে কিছুদিন দিল্লীতে বাস করতে হচ্ছে।

সে-দিন অফিসে বসে বসুমতী অফিসে ফোন করে খবর নিচ্ছি যে আমার লেখা "স্মোকৃরিং" গল্পটা কোন মাসে বেরোচ্ছে। গত তিনমাস ধ'রে বসুমতীর প্রাণতোষ ঘোটক-

মহাশয় প্রত্যেক মাসেই আশ্বাস দিচ্ছেন যে আগামী মাসে বেরোচ্ছে, এবং সেদিন তিনি জানিয়ে দিলেন যে গল্পটা নাকি ছাপার অযোগ্য। সুতরাং আমি যেন ফেরৎ নিয়ে যাই। এমন সময় মণিদা'র লেখা চার পাঁচটা টিকিট মারা খামে একখানি বিরাট চিঠি। তিনি লিখ্ছেন,—

দিল্লী
রয়্যাল হোটেল
রুম নং—৯
১২।১২।···

প্রিয়······

হঠাৎ আজ অনুভব করছি যে জীবনের কয়েকটা গ্রন্থী যেন জোরে পাকিয়ে যাচ্ছে। তুই বল্তিস্ কর্ম্মক্ষেত্রটাকে একটা ফুটবল Ground মনে করতে আর নিজেকে একজন Football Players. কথাটা তুই ঠিকই বল্তিস্, তবে আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলি। সেটা হচ্ছে Halftime জানিস্ তো, সময়ের চলার পথে প্রতিটি পদক্ষেপ যদি মাপ করে ফেল্তে হয় তাহলে সেটা আর চলা হয় না, সেটা হয় মাপা। এই যান্ত্রিক যুগে নিজেকেও যদি একটা যন্ত্র তৈরী করি তাহ'লে সে যন্ত্রটাকে চালাবে কে? তবে এখানে এসে দেখ্ছি যে দিল্লীর লোকেরা একরকম যন্ত্রই। এখানকার লোক-গুলোর সংগে ঠিক উপমা দেওয়া যায় সিনেমা

হাউসের পাখাগুলোর সংগে। তাদের যেমন মাত্র ছু'টি কাজ, একটি ঘোরা, অপরটি থামা। যতক্ষণ শো হয় ততক্ষণ ঘোরে, আর যখন শো বন্ধ হয় তখন থামে! এরাও ঠিক তেমনি। সকাল দশটা থেকে অনর্গল ঘোরে, মানে কাজ করে, আর বিকেল বেলায় কাজের শেষে নির্জ্জীব হয়ে থেমে যায়। আর কিছুই এদের করবার নেই। কাজের মাঝে Halftime-টাই আমার সবচেয়ে লোভনীয়। আমার কালকের একটা Half-time-এর ঘটনা বলি শোন।—

সকাল বেলা একটি Export Department-এর Officer-এর সংগে আলাপ করে হোটেলে ফির্‌ছি, হঠাৎ যেন পেছন থেকে মেয়েলী গলায় ডাক শুন্‌লাম,—"অ মশাই শুন্‌ছেন?' দাঁড়িয়ে গেলাম। পেছন ফিরে দেখি একটি তরুণী আমার দিকেই এগিয়ে আস্‌ছেন। প্রথমে ভাবলাম বোধহয় আমাকে নয়। এদিক ওদিক তাকিয়ে একবার দেখে নিলাম যে বাংলায় "মশাই" সম্বোধন করবার মতো লোক কাছাকাছি আর কেউ আছেন কি না। ততক্ষণে সম্বোধনকারিণী আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—"আচ্ছা, রয়্যাল হোটেলটা কোন দিকে বল্‌তে পারেন?" বল্‌লাম,—"আমিও রয়্যাল হোটেলেই যাচ্ছি; আপনিও ইচ্ছা করলে আস্‌তে পারেন।"

—"বেশ, তাহ'লে তো, ভালোই হ'ল।" মেয়েটি একটু হাসল।

সেখান থেকে হোটেলটা বেশ খানিকটা দূরে। আমি হয়তো বেড়াতে বেড়াতে যেতে পারতাম। কিন্তু এই ভদ্রমহিলাকে অযথা কষ্ট দিই কেন? কাজেই একটা টঙ্গাকে দাঁড় করাতে হ'ল। ভদ্রমহিলাকে পিছনের দিকে বসিয়ে আমি যখন সামনের দিকে বসবার উপক্রম কর্‌ছি হঠাৎ তিনি—"উঁহুঁ, উঁহুঁ" করে এক দারুণ আপত্তি তুলে বস্‌লেন। একটা পা মাটিতে আর একটা পা পাদানিতে রেখে আমি তখন থেমে গিয়েছি। একটু নাক সিঁট্‌কে আর একটু মুচকে হেসে তিনি বল্‌লেন,—"আরে রাম রাম, ওদিকে কি বসে? আস্থন, এদিকে আস্থন।" তাই উঠতে হ'ল, আর সত্যি বলতে কি উঠতে আনন্দও হল। তারপরে কি হল জানিস্? খানিক দূর যাওয়ার পর টঙ্গাটার পিছন দিক থেকে—মানে আমরা যেদিকে মুখ করে বসে আছি—সেইদিক থেকে আর একখানা টঙ্গা আস্‌ছিল। কনোট প্লেসের চৌমাথায় হঠাৎ পুলিশ হাত দেখানোয় আমাদের টঙ্গাটা থেমে গেলো, আর পিছনের টঙ্গার ঘোড়ার মুখটা প্রায় আমার পাশের মেয়েটির মুখের কাছে এসে পড়ল। আমি চীৎকার করে উঠলাম—আর মেয়েটি ছু'হাত দিয়ে আমায় প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল। আমাদের টঙ্গাটা তখন আবার চল্‌তে স্থরু করে দিয়েছে, আর আমার বুকের মধ্যেও তখন আরম্ভ হয়েছে ঘোড়ার নালের শব্দ। সাম্‌নে থেকে টঙ্গাটি তখন উল্টো দিকে মোড় ঘুরিয়েছে। মেয়েটি তারপর সেই

যে মুখ ঘুরিয়ে বসলো আর ঘাড় ফেরালো না, কান ছুটো আরো লাল হতে লাগলো। হোটেলের সাম্‌নে এসে টঙ্গা থেকে নেমে খুব আস্তে একটা ধন্যবাদ দিয়ে প্রায় ছুটেই মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। আর আমি? বুকের মধ্যে খানিকটা আনন্দ, উত্তেজনা আর Palpitation-এর Mixture নিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়িগুলো ডিঙোতে লাগলাম।

"যে পথে গিয়াছ তুমি।" থাক্, আজ এই পর্য্যন্তই।

—তোর মণিদা।

যাক্ পনের দিন বাদে মণিদা'র একখানা চিঠি পেয়ে খানিকটা শান্তি পাওয়া গেল। মনে মনে বললাম, "বেশ আছে ছোক্‌রা।" তাড়াতাড়ি একটা পোষ্টকার্ডে, ওর চিঠি পেয়েছি, আমরা ভালো আছি, আর ছু'একটা আজেবাজে কথা লিখে পোষ্ট কর্‌তে পাঠিয়ে দিলাম। তলায় জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়ে একটা Under-line-সহ লিখে দিলাম—রস, পাটালি?

ছু'দিন পরে মণিদা'র আর একখানা চিঠি পেলাম। মণিদা'র চিঠি পড়তে বেশ লাগে! কেমন যেন একটা 'কাব্যি-কাব্যি' গন্ধ বেরোয়।

রয়্যাল হোটেল

১৪।১২।···

প্রিয়······

তোর প্রশ্নের উত্তর হ'ল "ল্যাবেঞ্চুস্"। অর্থাৎ,

রসের মতো গিলেও নয়, পাটালির মতো কামড়েও নয়; বেশ চেখে চেখে, চুষে চুষে।

নাম তার কাবেরী চট্টোপাধ্যায়। জিজ্ঞাসা না করেই জেনেছি। দেখেছি তার খাতার (Portfolio) উপরে লেখা। কাবেরী নদী নয়, কাবেরী সমুদ্র। দেহের উত্তাল তরঙ্গমালা আকাশ না ফুঁড়লেও স্বচ্ছন্দে একটা দেহ ফুঁড়তে পারে। (ভয় নেই, পরীক্ষা করিনি)। তার দেহ ফোঁড়া ঢেউগুলোর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে যখন আলাপ করি তখন ধীরেন মিত্রের সেই গানটার কথা কেবলই মনে পড়ে যায়—"কাবেরী নদী জলে কে গো বালক (বালিকা)।" অবশ্য এ বালক সাঁতারুও ভালো, তাই, ভয় পায় না। যাই হোক্, কাবেরীর সংগে (দেবী বল্‌ব না, কারণ দেবীর দেবীত্ব দেবী আমার কাছে বিসর্জ্জন দিয়েছেন; মানে নামের পরে দেবী বল্‌তে বারণ করেছেন), খুবই জমে উঠেছে। এই কয়দিনেই এতো, পরে না জানি কি হবে। সত্যি বল্‌ছি ভাই, মেয়েটির মনোহারিণী সৌন্দর্য্য এবং শক্তি, দুই-ই জোরালো। এর মধ্যে ঘায়েল করে ছেড়েছে। বেশ বুঝতে পার্‌ছি, আমের খোসাটিকে বাদ দিয়ে শাঁসটিকে খাওয়ার মতো, কাবেরী (উপস্থিত) আমার দেহটিকে বাদ দিয়ে মনটিকে কামড়াতে আরম্ভ করেছে। কালকে রাত্রে আমার ঘরে এসে একটা গান শুনিয়ে গেছে। ভারী মিষ্টি গলা। অবশ্য বল্‌তে পারো, তাকে যখন মিষ্টি লেগেছে,

তার সব কিছুই তখন মিষ্টি লাগবে। কিন্তু সত্যিই তার গলাটি কিন্তু বেশ ভালো। সে গেয়েছিলো (গানটা তার কাছ থেকে টুকে নিয়েছি)—

সবুজে নীলেতে ওই মেশা—
এসো আজ সীমান্তের গান গাই।
যেথা হারায়েছে নীল
হারানো সবুজ
দুজনার মাঝে শুধু রেখা।
সেথা আঁধার আলোয় হবে দেখা।
চল আজ দুজনায়
সেই রেখার মাঝে মিশে যাই॥
সাদা ওই শুভ্র হাঁসের মত
মেঘও উড়ে ভেসে যায়
সেথা মিলাবো মোরা
দুজনার সেই হবে পরম মিলন,
মেঘও ডাকে শোন আয়।
মোদের মুখেও প্রতিফলিত হবে
ভোরের সোনালী
আর কালোর ছায়া
সেই অমর প্রাণ শুধু চাই॥

গানটি শুনিয়ে আমার হাতটাকে চেপে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলেছিল,—"স্বপ্ন দেখুন।" আর আমার নাকে এসে লেগেছিল একটা মিষ্টি সেন্টের

গন্ধের সংগে সংগে তার বুকের গন্ধ। তারপর গায়ের ওপর লেপটা টেনে দিয়ে সে চলে গিয়েছিল। শুধু বুকের ওপর ফেলে গিয়েছিল তার কপালের লাল কাঁচকড়ার টিপটা। আজ এই থাক্।

তোর—
মণিদা।

অফিসে দারুণ কাজের চাপ পড়েছে। এক মিনিট সময় নেই নষ্ট করবার। তারই মধ্যে মণিদার চিঠির একটা উত্তর দিয়ে দিলাম। সেই একটা বাঁধা গৎ। "সময় কোথায় সময় নষ্ট করবার।"

বৌকে একদিন সিনেমা দেখাতে হবে বায়না ধরছে, তারও সময় নেই।

রাত্রে বাড়ী ফিরে লতাকে বললাম,—"চল, আজকের ন'টার শোতে সিনেমা দেখে আসি।"

'কোডোপায়রিন্' ট্যাবলেটের মতো বড়ো বড়ো দুটো চোখ করে ভীষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "নটার শোয়ে?"

বললাম,—"হ্যাঁ, চলো না তাতে কী হয়েছে। তুমি তো আমার বৌ। লোকে তো আর বলবে না যে পাশের বাড়ীর মেয়েটার সংগে ফুর্ত্তি কর্তে বেরিয়েছি।"

—"যাঃ, ভারী অসভ্য।"

বললাম,—“তা অসভ্য হ’তে রাজী আছি, এখন তো চলো বেরিয়ে পড়ি।”

রাত্রে সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরে এলাম প্রায় শ’, ন’টার সময়। হ্যাঁ একখানা বই দেখলাম বটে, যা দেখলাম, তা যে আর জীবনে ভুলবনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বইটার কথা যখনই আপনারা জিজ্ঞেসা করবেন তখনই আমার উচ্ছ্বাস শুনতে পাবেন, “আহা ‘ভুলি নাই’ ‘ভুলি নাই’।”

তার পরের পরের দিন এবং আজ। আবার কাজের ভীড়ে “হারিয়ে গেছি আমি।” এমন সময় মণিদার তৃতীয় পত্র। বাড়ী গিয়ে পড়ব ভেবে পকেটে রেখে দিলাম।

বাড়ী ফিরে এক কাপ চায়ের সংগে সিগারেটের ধোঁয়া Punch করে মণিদা’র চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করলাম। বাবা, কী বিরাট চিঠি!

আগ্রা
“আগ্রা হোটেল”
১৬।১২।...

প্রিয়......

উপরের ঠিকানাটা দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছিস, না! কিন্তু আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই। এটা তো জানা কথাই। দিল্লীতে এলাম, আর আগ্রার তাজমহল দেখবো না? প্যান্ট পরবো আর প্যান্টের বোতামটা দেবোনা? তা কি হয়?

আজ সকালে মমতাজের প্রেমের প্রতীক, পৃথিবী-বিখ্যাত সম্রাট শাজাহানের মমতাজমহল দেখে এসেছি। সম্রাটের প্রেম আর ঐশ্বর্য্য সত্যই বিরাট ছিল। আর পাথরের গায়ে হাত দিয়ে অনুভব করে এসেছি, সেই সব কারিকরদের হাতের স্পর্শ। তাজমহল নির্ম্মাণের পর সম্রাট শা'জাহানের আদেশে যাদের হস্তচ্ছেদন করা হয়েছিল। কিন্তু তবু ভালো লাগ্‌লো সেই শুক্‌নো শুভ্র পাথরের বাড়ীটাকে। মনে পড়ে গেল কবির কথা—। কবি যে বলেছেন,—"A dream in marble." সত্যই তাই। অদ্ভুত ক্ষমতা সেই সব কারিকরদের। কী সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, কী অদ্ভুত পাথর মেলাবার ক্ষমতা। সব মিলিয়ে যেন এক স্বপ্ন তৈরী হয়েছে। আবার অন্যদিক থেকে কবির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়,—"মর্ম্মরের মৌন ক্রন্দন।" সত্যই যেন সেই শুক্‌নো খট্‌খটে পাথরের বাড়ীটার প্রতিটি পাথর থেকে তিনশো সতেরো বছরের অফুরন্ত কান্না আজও ঝরে ঝরে পড়ছে এই উদাসীন পৃথিবীর খানিকটা মাটির ওপর।

যাক্, পাথরগুলোর অনেক প্রশংসা করা গেল। আজ রাত্রে চাঁদের আলোয় আর একবার দেখতে যাবো। এখন বিকেল সাড়ে পাঁচ্‌টা। রাত্রে তাজ দেখে ফিরে এসে আবার লিখ্‌বো।

......এখন রাত্রি ন'টা বেজে একুশ মিনিট। এই সবেমাত্র তাজ থেকে ফিরেই আবার লিখতে বসেছি।

ধরে' নে যেন তাজমহলে বসেই তোকে লিখ্ছি। মন দিয়ে পড়িস্। (আমার) ভাগ্যটা যে "ঘোলা জলের ডোবা" নয়, দেখ্তে পাবি। অহঙ্কার কর্ছি না। আমার ভাগ্যরেখার খাঁজে খাঁজে খানিকটা করে আচার লেগে আছে। তবে উগ্র নয় বেশ মিষ্টি, টম্যাটোর চাট্নীর মতো। এইবার আরম্ভ করি শোন, I mean, পড়্।

শীতের ঝাপ্সা রাত। কুয়াসার ছাঁক্নী থেকে ঝরে পড়ছে চাঁদের আলো। মাটিতে ঠেকে যাওয়া বিছানার ঢাকার মতো ঢেকে রয়েছে শুভ্র তাজমহলটার সবটাকে। শরীরে এসে লাগ্ছে স্পর্শের অনুভূতি। জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে আমরা পরস্পর যেন পরস্পরকে স্পর্শ করে রয়েছি। সাম্নে ফোয়ারার জলের উপর চাঁদটা স্থির। ফোয়ারা এখন বন্ধ, জলই শুধু জমে রয়েছে। মাঝে মাঝে মৃদু হাওয়ায় থির্ থির্ করে কাঁপছে। মুখে চোখে এসে বিঁধ্ছে শীতের কন্কনানি। কতো অদ্ভুত প্রশ্ন, কতো রাজ্যের স্বপ্ন, কতো মধুর কল্পনা মনের বাজনায় একবার করে আঙ্গুল ছুঁইয়ে যাচ্ছে। কল্পনা সমুদ্রের তরঙ্গের মাথায় মাথায় নেচে চলেছি কল্পনা থেকে কল্পনায়। চলে গেছি শা'জাহানের যুগে—সম্রাট তাঁর প্রিয়তমা মহিষীকে যখন তাজমহলের কথা বল্ছেন, মমতাজের সেই সময়কার মুখটিতে। আজও, এখনও তাঁদের বক্ষের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন এই শুভ্র প্রস্তরে আঘাত খেয়ে খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফির্ছে, আজও প্রতিরাত্রে গভীর নিশীথে সম্রাট তাঁর

প্রিয়তমার মুখচুম্বন করছেন, আজও অদৃশ্য আলোর ঝল্‌মলানিতে অদৃশ্য পুষ্পে মোড়া কফিন পালঙ্কে সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর প্রেম নিবেদন চল্‌ছে। প্রেম অমর, প্রেম অক্ষয়, প্রেমের শেষ নেই। খানিকক্ষণ এলোমেলো চিন্তার পর সবকিছু যেন গুলিয়ে গেল। এইবার কল্পনার মোড় ঘুর্‌ছে। আবার মনে পড়্‌ছে সেইসব হতভাগ্য অমর কারিগরদের। তারপরই মনে আস্‌ছে সম্রাটের এই বিরাট ঐশ্বর্য্যের কথা। তাজমহল নির্ম্মাণ করতে যে অর্থ তিনি ব্যয় করেছিলেন সেই অর্থ আজ যদি আমাদের স্বাধীন ভারতের কাজে লাগানো যেত তাহ'লে ভারতের কতোই না উন্নতি হ'তে পার্‌তো। কিন্তু হায়, কল্পনারও ক্ষমতা নেই একে এড়িয়ে যাবার। সব কল্পনার শেষে কল্পনাকেও ঘুরে আস্‌তে হবে এই Politics-এ। সব-কিছুর শেষে এসে দেখা দেবেই Politics। সাহিত্যেরও ক্ষমতা নেই এর ব্যাসিলি থেকে মুক্তি পাবার। (ক্রমে ক্রমে সাহিত্যটাই যেন Politics না হয়ে যায়, সেইটেই আমার ভয়।)

বন্ধু, এইবার শোনো আমার চাট্‌নী মেশানো ভাগ্যটার কথা। চাঁদের আলো মেখে বসে বসে এই সব চিন্তা কর্‌ছি, ঠিক এমন সময় পেছন থেকে কে আমার চোখ দু'টো টিপে ধরল। চম্‌কে উঠ্‌লাম! আর সেই চম্‌কানির সংগে সংগে কানে এসে বাজ্‌লো চুড়ীর ঠুন্‌ ঠুন্‌ শব্দ। তারপরেই হাসির পিয়ানো বাজিয়ে সাম্‌নে এসে

দাঁড়ালো কাবেরী। বল, বন্ধু বল, ভাগ্যটাতে কি চাট্‌নীর গন্ধ পাচ্ছ? কাবেরী আমার পাশে এসে বসল। তার বাঁ দিকের গালে 'বুখারা', 'সমরখন্দ' বিলিয়ে দেবার মত কৃষ্ণ তিলটা চাঁদের আলোয় চিক্ চিক্ ক'রে উঠ্‌ল। মন যেন আপনা থেকে বলে উঠ্‌ল "দিউয়ানা হুঁ"।

বিহ্বল, রোমাঞ্চিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—"তুমি!"

—"হ্যাঁ, কেন? আস্‌তে নেই?"—চোখে তার কৌতুকের হাসি।

তাকে আস্‌তে আছে কি নেই তখন অত ভাববার সময় আমার ছিল না। সে যে এসেছে সেইটাই সব এবং তখন!

—"Wang Lung gave a hoarse laugh into the darkness and seized her" এবং আমিও। বুকের উপর তখন চলেছে চাণক্য সেজে শিশিরবাবুর লম্ফ। সে যে কী অবস্থা, কী আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা নেহাতই ছেলেমানুষী।

শা'জাহানের তাজমহলের তলায় জ্যোৎস্নার জলে নেয়ে দু'জনে পাশাপাশি, জড়াজড়ি। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে" আকাশ যে নীল বন্ধু, ধরণীর মন্থনের বিষে, সে কথাও ভুলি"।

রাত্রি সাড়ে দশটা। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। এবার উঠি। তুই আর সিনিয়রিতা আমার ভালোবাসা জানিস।

তোর

মনিদা'।

চিঠি শেষ করে মুখ তুলেই দেখি সামনে লতা দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে। হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল লাফিয়ে উঠে আলোটা নিভিয়ে দিলাম।

অন্ধকারের মধ্যে চাপা গলার আর্ত্তনাদ শোনা গেল—"যাঃ ভারী অসভ্য। উঃ, ঠোঁট্‌টা এমন জ্বালা কর্‌ছে। কী হ'ল বলতো? হঠাৎ পাগোল হ'য়ে গেলে নাকি? মাঝে মাঝে কী যে হয় তোমার।"

বললাম,—"সেইটেই তো বুঝিনা। শুধু বুঝি—

'এসো এসো বঁধু এসো,
আধেক আঁচরে বসো,
অবাক্ অধরে হাসো
ভুলাও সকল তত্ত্ব।' "

সেইদিন থেকে আজ এই চারদিন। কাজের চাপটা একটু কমেছে, বৌ-এর আব্দারটা একটু বেড়েছে। কাজটা একটু কমা আর আব্দারটা একটু বাড়ার মাঝামাঝি "আমি এখন সময় করেছি" একটু লিখ্‌বার।

অফিসে বসে খবরের কাগজের কলমগুলোর উপর একবার ক'রে চোখ ঠেকিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ নজর পড়ল " 'ঢাকুরিয়া' লেকের জলে ডুবিয়া একটি মেয়ে ও একটি ছেলে আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহাদের মৃতদেহ দুইটি জলের উপর ভাসিতে দেখা যায়। জলে ফুলিয়া তাহাদের চেহারা এরূপ বীভৎস হইয়াছে যে তাহাদের কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারা

যায় নাই এবং নিকটস্থ একটি বেঞ্চের তলা হইতে একজোড়া স্যাণ্ডাল্ ও একজোড়া কেড্স্ পাওয়া গিয়াছে।" মনে মনে বুঝ্লাম, কেড্স্ জোড়াটি সজনীবাবুর। এমন সময় কার্ত্তিক-বাবু (আফিসের এক কর্ম্মচারী) একখান চিঠি দিয়ে গেল। মণিদার চতুর্থ পত্র।

দিল্লী
রয়্যাল্ হোটেল
২০।১২।···

প্রিয়···

সমুদ্রের তীরকে তরঙ্গের আঘাত সহ্য করতেই হবে। তীর যতোই দূরে সরে থাক তার নিষ্কৃতি নেই। তরঙ্গের চাবুক তার উপরে পড়বেই। আমাকেও সহ্য করতে হয়েছে অনেক কিছুই। সংসারের ঝড়ঝাপ্টা, প্রিয়া বিচ্ছেদ, বন্ধুর শত্রুতা—তুই তো জানিস্। বহুবার সুন্দর অসুন্দরের দেউলে অনেক মাথা ঠেকিয়ে এসেছি। অনেক কিছুই বুঝ্তে পারি। অনেককেই চিন্তে পারি একবার আলাপ করেই। বুঝ্তে পারি সে কিসের খোলস প'রে আছে। কিন্তু আজ আমার পরাজয়। কাককে কোকিল মনে করে আজ আমার অহঙ্কার ভেঙেছে। কি লিখ্বো ভেবে পাচ্ছিনা। "Words আসিবে কোথা হইতে? Heart কোথায়?" যার কথা এতোদিন ধরে কতো আবেগ দিয়ে লিখে এসেছি আজ যেন আর তার কথা

লিখ্‌তে পার্‌ছি না। তুই বিশ্বাস কর্‌বি? এতোদিন ব্যাপারটাকে হাল্‌কা রঙ্‌চঙে দেখ্‌ছিলাম, কিন্তু আজ সেটা গম্ভীর হয়ে গেছে। সে একটা চোর—এছাড়া তাকে আর কিছুই বলা যায় না। আজ খালি মনে পড়ছে তোর লেখা সেই কবিতাটা—

"তরঙ্গিল সমুদ্রজল
ধরিত্রী আজ বিবসনা,
রুদ্র শিবের কাল নাচনে
সৃষ্টি যেন শিব-রসনা।"

ছোট্ট পালতোলা নৌকোর মতো এক টুক্‌রা শাদা মেঘের পাশেই বিজ্ঞানের ক্রুদ্ধ গর্জ্জন।

আগ্রায় যাওয়ার আগে আমার ঘরের তালাটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। তখন সে আমায় একটা তালা দিয়েছিল। এখন বুঝ্‌তে পারছি যে তার কাছে একটা duplicate চাবীও ছিল। সে সেই: চাবী দিয়ে আমার ঘর খুলে সব কিছুই নিয়ে গেছে—শুধ্‌ টেবিলের উপর রেখে গেছে একটা চিঠি। সেটা তোকে লিখ্‌ছি—পড়্‌।

মণি প্রিয়···

জানি, এই সম্বোধনটাকে আজ আর তুমি সহ্য করতে পারবে না। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে স্বপক্ষে কিছুই বল্‌বো না। তোমার কাছে আমার জীবনের একটা দিক

অন্ধকারই থাক্‌বে। যদি কোন দিন আবার দেখা হয় বল্‌বো কেন এই প্রবঞ্চনা। তবে তুমি বিশ্বাস করতে পারো যে আমার এই ভালোবাসাটাও প্রবঞ্চনা নয়। তুমি ভাব্‌ছো, এখন আমি যা বল্‌ছি সবই মিথ্যা। নয় কি? প্রবঞ্চিতা বলেই আজ বঞ্চিতা হলাম তোমার ভালোবাসা থেকে। আর বঞ্চনা করলাম আমার বিবেককে। যদি কোনদিন দেখা না হয় সারা জীবন ধরে আমায় সহ্য কর্‌তে হবে একটা বিষমাখানো তীরের যন্ত্রণা।

তোমারই ভালোবাসার (?) কাবেরী।

বুঝ্‌লাম তার ভ্রামরী-মিত্রতা। তার ছদ্মবেশ আজ আমার কাছে সে খুলে ফেলেছে। একটা মেয়ের জন্যে সমস্ত নারীজাতির উপর মন বিতৃষ্ণায় ভ'রে উঠেছে। এখন রাত্রের তাজমহলের কথা ভাবলেই চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ছে চাঁদ থেকে গরল গড়িয়ে পড়েছে পাথরের কবরখানাটার উপর। সুন্দরকে আজ সহ্য করতে পারছিনা। জগতের সবকিছু সুন্দরই যেন বিশ্বাসঘাতক। ভালো লাগলেই আঘাত পেতে হবে। অবশ্য এখানে আমি শুধু মলাটের কথাই বল্‌ছি। মনে পড়্‌ছে সজনীবাবুর সেই কবিতাটা —?

"বৃথা অনুযোগ। ঘটেছে তাহাই
ছিল যা আমার ললাটে
ভিতরে কি ছিল না-দেখিয়া হায়
দেখেছিনু শুধু মলাটে।"

মনের মধ্যে আজ দারুণ দ্বন্দ্ব চলেছে। কাজে বেরোতে পারছি না। মনের অবস্থা খুবই খারাপ। ঝড়ের মুখে উড়ে যাইনি বটে তবে বেঁকে গেছি বেশ খানিকটা। পয়সাকড়ি কিছুই নেই। তুই পত্রপাঠ T.M.O. ক'রে হাজার দেড়েক টাকা পাঠিয়ে দিস্। দিন তিনেক বাদে এখান থেকে একবার এলাহাবাদ যেতে হবে, কাজের জন্যে।

এটাও আমার একটা halftime-এর সময়। প্রথমের halftime আর আজকের halftime-এর মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য আছে কি? সেদিনের half-time এ সে যেমন হঠাৎ এসেছিল আজকের halftimeএও সে তেম্‌নি হঠাৎ চলে গেছে। পার্থক্য শুধু্ আসা আর যাওয়ার!

মনকে প্রবোধ দিচ্ছি আর কি! T.M.O. টা পাঠাস্ কিন্তু। তোর··· মনিদা'।

সঙ্গে সঙ্গে অফিস থেকে দেড়হাজার টাকার একটা T.M.O. পাঠিয়ে দিলাম মণিদা'র ঠিকানায়।

চিঠিটা পড়ে মনটা বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। মণিদার মুখটা চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌লো। বেচারা। আর মনে মনে কাবেরীর একটা মূর্ত্তি ভেবে নিয়ে ঘৃণায় মুখটা ফিরিয়ে নিলাম একজন কর্ম্মচারীর দিকে। আমার ঘৃণাভরা মুখটার দিকে চেয়ে চোখটা সে নামিয়ে নিল। তার মুখে এক ঝুড়ি

দাঁড়ি-গোঁফ্। বোধহয় পাঁচদিন কামায়নি। আমিও খানিকটা অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম।

বিশেষ কিছু কাজ ছিল না, শরীরটাও ভাল নয়। তাই তাড়াতাড়ি করে বাড়া ফিরে এলাম। ঘরে ঢুকেই দেখি মেঝের উপর একখানা "অচল পত্র" দাউ-দাউ করে জ্বল্ছে আর লতা সেই আগুনে একটা বাটী করে খানিকটা দুধ গরম করছে। জিজ্ঞাসা করলাম,—"শুধু শুধু বইটাকে পোড়াচ্ছ কেন?"

একটু হেসে লতা বললে,—"কেন? পড়োনি? এতেই তো লেখা আছে ছোট ছেলেদের দুধ গরম করবার, তাই ঠাকুরঝির ছেলের দুধটা একটু তাতিয়ে নিচ্ছি।"

বললাম,—"সাবাস! তা বেশ, তোমার দুধ তাতানো হয়ে গেলে আমার ভিজে কাবুলী জুতোটাও একবার সেকে দিও; একটু damp হয়ে গেছে।'

বাইরের ঘরে এসে ইজিচেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিলাম। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। বাইরে তখন মেঘের ঘেরাটোপের মধ্যে আকাশ ঝিমুচ্ছে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ঘেরাটোপের ফাঁক দিয়ে বিদ্যুতের উঁকি মারা। অসময়ের দু' এক ফোঁটা বৃষ্টিও সুরু হয়ে গেছে। পাশের "জানালায় বৃষ্টি এসে টোকা দিয়ে ডাকে" যেন। চিঠির প্যাড্টা টেনে নিলাম। মণিদা'কে একটা চিঠি লিখ্তে হবে।

আজে বাজে কথায় ছ'সাত লাইন ভরিয়ে দিলাম। তারই মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম খানিকটা সান্ত্বনা আর উৎসাহ।

মণিদা'র চিঠিতে সজনীবাবুর কবিতার 'কোটেশান্'টা পড়ার সংগে সংগে, কবিগুরুর কয়েকটা লাইন মনে পড়েছিল,—

"সত্যমূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে সৌখিন মজদুরি।"

রাত্রে শোয়ার আগে সমস্ত নারী-জাতির উপর বিতৃষ্ণা এসে আমার বৌ-এর উপর কি রকম একটা Sym-pathy এলো। নাঃ আমার বৌ কখনো ওরকম হতে পারে না। সে বড্ড ভালো। বেচারা। হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল বৌ-এর একটা গান শুনি। অনেক কাকুতি মিনতির পর বৌকে রাজী করানো গেল। অর্গানটার সামনে বসে একবার আড়চোখে দেখে মুচ্‌কি হেসে আরম্ভ করলো।

তোমার মনের মন্দিরে আজ
আমার দেওয়া মালা।
আমার মনের অন্ধকারে
তোমার প্রদীপ জ্বালা।
পুষ্প দিয়ে গেঁথে রাখি
তোমায় দেবার পুষ্পরাখী,
আমার তরে সাজিয়ে রেখো
তোমার স্বর্ণ ডালা।
আজিকে তোমার দেউল মাঝে
এসেছি আমি রাজার সাজে,
তোমার হাতের দীপের আলোয়
আমার জীবন আলা॥

চীৎকার করে উঠলাম—“বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা।” নীচের রাস্তা থেকে একটা ফাজিল ছোক্‌রাও চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, “বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা।”

—“বেশ, হ’ল তো ?”

বললাম,—“হ’ল আর কি ? ওর ও ভালো লেগেছে, তাই ও-ও চেঁচিয়েছে।”

পরের দিন সকালে শয্যাত্যাগ কর্‌লাম সাতটার সময়। শীতকালের সকালে শয্যাত্যাগ যেন দারুণ গ্রীষ্মে মেট্রো সিনেমা থেকে বেরিয়ে আসার মতো অপ্রীতিকর। যাই হোক অনিচ্ছাসত্বেও সকালের প্রাতঃকৃত্যগুলো সমাপন করতে হ’ল। চেয়ারে এসে বসতেই একটা সিল্কের হাতকাটা জামা পরে দাঁতে ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ করতে করতে লতা এসে ঘরে ঢুক্‌লো। হাতে এক কাপ চা। বললাম,—“কি গো, তুমি ও কি শেষে সজনীবাবুর ভাষায় এবং “প্রতিভার” সাত নম্বরের defination-এর মতো প্রতিভাণী হয়ে উঠলে নাকি ? তুমিও কি প্রতিভাণী হওয়ার এই থিয়োরীর উপর experiment চালিয়েছ ? মানে সকলে যা করে তুমি তা না ক’রে ? সর্ব্বনাশ সজনীবাবু আমার বৌ-এর মাথাটিও খেলেন দেখছি। যাও শীগগীর গায়ে গরম জামা দিয়ে এসো।”

একটু হেসে লতা বললে,—“বেশ গরম জামা নয় পরছি, কিন্তু উল্টো করে পরব।”

খানিক বাদে একটা গরম জামা গায়ে দিয়ে লতা এসে

দাঁড়ালো। জামাটা অবশ্য সোজা করেই পরেছে। পেছন থেকে মাথার চুলগুলো ঘেঁটে দিতে দিতে হঠাৎ ঘুরে এসে আমার সাম্‌নের চেয়ারটায় ধপাস্‌ করে বসে পড়ল। তার পরই একটা বিশ্রী নাকিস্সুরের আব্দারী ঢঙে—উঁ—করে সুর টান্‌তে লাগলো। বললাম,—"ব্যাপার কী, অমন করছ কেন? ভূতে পেল নাকি?"

—"আমার কিন্তু একটাও ভালো দুল নেই। একজোড়া কিনে দিতে হবে কিন্তু,—আজকেই।"

বললাম,—"এই সকাল বেলা সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠেছি, এখনো পর্য্যন্ত একটা সিগারেট ধরাই নি। এখনই ওসব কি? আর তুমি কিনা বিংশ-শতাব্দীর শিক্ষিতা মেয়ে হয়ে একটা দুলের জন্য বায়না কর্‌ছ! ছিঃ।"

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দড়াম করে চেয়ারটাকে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে লতা চেঁচিয়ে বলে গেল,—"চাইনা, যাও; তোমার কাছে কোনদিন আর কিছু চাইব না।"

বললাম,—"সর্ব্বনাশ, অমন কাজ কি কর্‌তে আছে? তাহলে তুমিও ঠক্‌বে—আমিও ঠক্‌ব। তার চেয়ে এক্ষুনি তোমার জন্যে আমি একটা কাঠের দুল এনে দিচ্ছি।"

—"কাঠের দুল? সে কি? কাঠের দুল কী হবে?

বললাম,—"সোণার দুলের প্রয়োজন কি?

'রূপসীর কী-কাজ ভূষণে? যা ধরে তনুপরে
স্বর্ণ হয় রূপশ্রীর পরশ মণিবরে।"

লতা এবার কাছে এসে আস্তে আস্তে বললে, "সত্যি,

তুমি কিন্তু আমায় একটুও ভালোবাসনা। তোমার ভালোবাসায় আমার সন্দেহ হয়।”

বললাম,—“ভালোবাসিনা? বল কি? সামান্য একটা ছুলের জন্যে একেবারে ভালোবাসায় কটাক্ষপাত? প্রিয়ে,— অনুভব করো প্রাতঃকালীন চুম্বনে এখনো তোমার ঠোঁট উষ্ণ। চেয়ে দেখ আমার বক্ষের পেষণে এখনো তোমার বক্ষাবরণ অবিন্যস্ত। এখনো তুমি সন্দেহ করো আমার ভালোবাসায়? ওঃ —;

‘Doubt that the stars are fire
Doubt that the sun doth move
Doubt truth to be a liar
But never doubt I love.”

লতার হাতটা আমার হাতের মুঠোয় টেনে নিলাম।

—“ভণিতা ছাড়। বল, আজ তুমি আমার ছুল কিনে দেবে কি-না?”—লতার স্বর তীক্ষ্ণ।

চটাতে আর সাহস হ’ল না। বললাম,—“তথাস্তু বিকেলের দিকে বেরোন যাবে, কী বল?”

কাজ আর অকাজের ভিতর দিয়ে তিনটে দিন পেরিয়ে গেছে।

অফিসে ঢুকেই দেখি টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে মণিদার একখানা চিঠি আর মাসিক পত্রিকা “শুক্তমতী”-ফেরৎ ‘ধূম্রবলয়’ গল্পটা। গল্পটা পকেটে নিয়ে বুঝলাম যে, এর চেয়ে

যে সব খারাপ গল্প শুষ্কমতীতে ছাপান হয় তাদের লেখকদের নিশ্চয়ই একটা করে তেলের দোকান আছে এবং শুষ্কমতীর চালক সন্তোষবাবু অর্থাৎ যিনি শ্বশুরের পয়সায় ক্রমে ক্রমে উপরের ধাপে উঠছেন, তাঁর নিম্নাঙ্গ অত্যন্তই শুষ্ক। যাই হোক্, মণিদা'র চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলাম।

'গগনবিহারী' প্লেন
২৪।১২।...

প্রিয়...

অসীম শূন্যের বুকে ভেসে চলেছি। যন্ত্রের সামান্য পাগলামীতে বিপর্য্যয় হয়ে যেতে পারে। মহাব্যোমের বুকে শেষটুকু জীবিত কিংবা মৃতের কোন কিছুর ইসারাই আঁকা নেই। জান্‌বো শুধু মাটির স্পর্শে। অসীম আকাশের ভরসা এখন শুধু এই যন্ত্রটার যন্ত্রগুলো আর তার দু'টো ডানা।

"শুধু দু'টি তীব্র তীক্ষ্ণ দুঃসাহসী ডানা
আকাশের মানেনা সীমানা।"

তলায় মেঘেদের ধোঁয়াটে জলের সমুদ্র। উপরে নীল শূন্যের প্রান্তর। মাঝে মাঝে মেঘসমুদ্রের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঝাপ্‌সা বনানীর সব্‌জে মুখ। কানে এসে বাজছে 'প্রপেলারের' শূন্যজয়ের ক্রুদ্ধ গর্জ্জন।

আমাদের 'গগনবিহারী' ন'হাজার আটশো ফিট্ উঁচু দিয়ে মেঘ মাড়িয়ে ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে এক একটা

জমাট মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাদের স্তর কাটাবার জন্যে 'বাষ্প' কর্‌ছে। সেই সময় পেটের মধ্যে কেমন একটা গুর্‌ গুর্‌ করে উঠছে। আমাদের প্লেনে—

"যাত্রী আছে নানা,
নানা ঘাটে যাবে তারা কেউ কারো নয় জানা।"

কেউ যাবে কলকাতায়, কেউ যাবে গয়া আবার কেউ বা হয়তো আমার সংগে এলাহাবাদেই নেমে পড়বে।

আমার সামনের ভদ্রলোকটি কোলের উপর একখানা 'Talkie Herald' রেখে চোখ বুজিয়ে একটা শার্টন্যাপ (Short Nap) দেবার চেষ্টা কর্‌ছেন। কতক্ষণই বা আর একদিকে ফিরে বসে থাকা যায়? জানলার দিকে ফিরে ফিরে ঘাড়ে ব্যাথা হয়ে গেছে। ভদ্রলোকটির কাছ থেকে বইটা চেয়ে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগ্‌লাম। হঠাৎ একটা পাতার ভেতর থেকে একখানা ফটো মেঝেতে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখি ফটোটা কাবেরীর। সেটাকে আবার বইয়ের মধ্যে যথাস্থানে ঢুকিয়ে রেখে ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দিলাম। আর তার একটু পরেই তোকে চিঠি লিখ্‌তে বসেছি।

বলতে পারিস্‌, ভগবান আগে কাঁটা দিয়ে পরে ফুল তৈরী করেছেন, না, আগে ফুল তৈরী করে পরে কাঁটা দিয়েছেন?

তোর······মণিদা'

পুনশ্চ। এলাহাবাদে পৌঁছে গেছি। পরশু দিন কলকাতায় ফির্‌ছি। হিন্দুস্থান বিল্ডিংএ গাড়ী পাঠিয়ে দিস্।

"যাক্ ছোক্‌রা তাহ'লে এবারে ফির্‌ছে" স্বগতোক্তি করলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য! কুড়ি তারিখের মণিদা'তে আর চব্বিশ তারিখের মণিদা'তে যেন কোনই মিল নেই। অতবড়ো একটা আঘাতের পর এমন কাব্য করে চিঠি সে কী করে লিখ্‌তে পার্‌লো! আশ্চর্য্য, অদ্ভুত!

বাড়ীতে ফিরে লতাকে বললাম—"কালকে মনিদা' আস্‌ছে।"

মণিদা' আস্‌ছে শুনে লতা তো আনন্দে অস্থির। বললে,—"দাঁড়াও মনিদা' আসুক। এইবার তোমার চালাকী ভাঙ্‌বো। সব বলে দেব। সেদিন তুমি ফুল কিনে দেবে বলে বিকেল বেলা মিছিমিছি খানিকটা বেড়িয়ে নিয়ে এলে, আর কালকে পানের সংগে খানিকটা সিদ্ধি খাইয়ে দিয়েছিলে। তোমার চালাকী বার করবো মণিদা' একবার আসুক না।"

বললাম,—"আচ্ছা বেশ, আমিও বলে দেবো—কাল রাত্রে তুমি আমায় পঁয়ত্রিশটা চুমু—"

—"যাঃ যতো সব ঐ।" লতা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। চেঁচিয়ে বললাম,—"এক কাপ চা নিয়ে এসো, আর এক জোড়া বিস্কুট।"

পরের দিন। সকাল বেলা চান খাওয়া সেরে চেয়ারের উপর বসে আছি। মণিদা' আজকেই আস্‌ছে। তাই আজ আর অফিস যাইনি। নীচে মোটরের শব্দে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি মণিদা' এসে গেছে, দোতলার সিঁড়ির মুখে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সিঁড়ির বাঁক ঘুরে দুজনেব সংগে দু'জনের চোখোচোখি হতেই চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম,—"হ্যালোঁ জঁনিঁ, পৃথিবীটার খবর কি?"

—"মঙ্গল, মঙ্গল।" এক ঝলক্ হাসির ভেতর দিয়ে কথাটা মণিদা'র মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। (আমাদের মধ্যে পৃথিবী কথাটার একটা বিশেষ কিছু অর্থ ছিলো।)

কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারলাম না। মণিদা'র মনের ভাবটা প্রকৃতই কী বোঝবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম,—"কী হে, তোমার তার খবর কি?"

—"তার খবর? কার বলো তো?" মণিদা'র চোখে বিস্ময়।

বললাম,—"সেই গো সে, তোমার সমুদ্দুর।"

—"ওঃ হো, কাবেরী?" একটু হেসে—"বেঁচে আছে নিশ্চয়।"

'ফুটিল একটি ফুল, দিনান্তে ঝরিয়া মরে গেল,
একথা কি মনে রাখে সূর্য্যের আলোক?"

হাস্‌তে হাস্‌তে ঘরে ঢুকে মণিদা' একটা লজেন্স মুখে পুরল। তারপরেই আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলো,—

"কই, সিনিয়রিতা কোথায় গেল? তাকে তো দেখ্‌ছি না!" মণিদা' লতাকে সিনিয়রিতা বলে ডাকে।

সংগে সংগে দরজার পর্দ্দাটা নড়ে উঠ্‌লো। আর পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে প্রথমে একটা চায়ের কাপ তারপর একখানা চুড়িপরা হাত এবং তারোপরে হাস্যময়ী লতাকে দেখা গেল। "এই তো আমি, আপনার জন্যে চা আন্‌তে গিয়েছিলাম। শরীর কেমন আপনার?"—লতা কাপটা মণিদা'র দিকে এগিয়ে দিল।

—"শরীর ভালই; কিন্তু এতো শীগ্‌গীর এতো গরম চা? তৈরী করলে কী করে বলোতো?"

—"ঠকে গেলেন তো? চা তৈরী করিনি, 'থার্‌মোফ্লাস্ক্' থেকে ঢেলে আনলাম।"

—"OH! Clever girl"—মণিদা' অট্টহাস্য করে উঠ্‌লো।

২

চারমাস পেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই ঘটেনি। তবু···

দিন পনোরোর জন্যে আমি আর লতা দেওঘরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাড়ীর আর সকলের টিট্‌কারি উপেক্ষা করেই অবশ্য। আমাদের পাঁচ সংসারের বাড়ীতে বৌকে নিয়ে বিদেশ যাওয়া অত্যন্তই বেহায়াপনা। যাইহোক্, আমার নতুন খবর হ'ল এই।

এবার মণিদার একটু খবর বলি। মণিদার দাদু, মণিদা'র বিয়ের জন্যে খুব চেষ্টা করছেন এবং একজন অনাত্মীয় মারফৎ একটি সন্ধানও পাওয়া গেছে। ভদ্রলোকের ছয়টি মেয়ে। বড়টি বিবাহিতা। ছয় বোনের নাম যথাক্রমে অশ্রুকণা, অশ্রুলিখা, অশ্রুলিপি, অশ্রুরেখা, অশ্রুধারা। মেজবোন অশ্রুলিখাই পাত্রী। বড়টিকে কিছুদিন হ'ল ভদ্রলোক পার করেছেন। তারপরের তিনটি মেয়েই বিবাহযোগ্যা, সুতরাং, বলা বাহুল্য ভদ্রলোকের বিশেষ কিছু খরচ করবার উপায় নেই। তবে—কিছু দেবেন। মেয়েটিও দেখতে শুন্‌তে ভালো, আর মণিদার সংগে কিছুটা পরিচয়ও আছে। একদিন সিনেমা দেখ্‌তে গিয়ে দু'এক ফালি হাসির বিনিময়ও হয়েছে।

এতোক্ষণ ধরে অতীত বলা গেল। এইবার আবার বর্ত্তমানে ফিরে আসা যাক্।

···মণিদাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হে, তা হ'লে জোড়া হচ্ছ ?"

—"আরে দূর্···। বিয়ে করে কী হবে ? এই তো বেশ আছি। সংসারের লাঙল কাঁধে তুলে কী আর এমন দশবারোটা মুণ্ডু গজাবে ? তবে হ্যাঁ, দুটো শিঙ্ বেরোবে বল্‌তে পারিস্। লাঙল শুধু কাঁধে তুললেই তো আর হবে না, তোদের মতন টান্‌তেও তো হবে ! আর তুই যেমন বিয়ে করে লাঙল টানবার জন্যে চারপেয়ে জানোয়ারগুলোর মতন হ'য়েছিস আর দুটো শিঙ্ বেরিয়েছে আমারও তেমনি দু'টো শিঙ্ বেরোবে। তোরা কি আর মানুষ রে ? তোরা সব

শৃঙ্গধারী।” হঠাৎ দরজার সাম্‌নে লতাকে দেখ্‌তে পেয়ে তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে,—“বল্‌ছিলাম কি যে আজ রবিবারের বাজার, ষ্টীমারে করে একবার বোটানীক্যাল গার্ডেনে বেড়িয়ে এলে হয় না ?”

লতা তখন কোমরে হাত দিয়ে মণিদা'র পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বললে,—“থাক্, আর কথা ঘোরাতে হবে না। দরজার পাশ থেকে সবই আমি শুনেছি। এখন বলুন দেখি, আমাদের দু'টো শিশু বেরিয়েছে না আপনার মনের দু'টো পাখা গজিয়েছে ?”

হঠাৎ আক্রমণে এবং কথার ভাবার্থ গ্রহণে অসমর্থ হয়ে মণিদা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—“কেন ?”

—“আর কেনয় দরকার নেই। আপনার টেবিলের ব্লটিং প্যাড্‌টা পাল্‌টে ফেলুন।”

আমিও কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম,—“কেন বলো তো ? ব্লটিং প্যাড্‌টায় মণিদা' আবার কী করলো ?”

—“করবেন আর কি ? সমস্ত ব্লটিং প্যাড্ ভর্ত্তি করে তিনি খালি ‘অশ্রুলিখা’ আর ‘অশ্রুলিখা’ই লিখে রেখেছেন।”

“ধ্যাঃ দ্যাঃ” করে একটা লজ্জার হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে মণিদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দেড়টা দু'টো নাগাত তক্তাঘাট থেকে বোটানীক্যাল গার্ডেনের যাত্রী হয়ে আমি আর মণিদা ষ্টীমারে চেপে বসলাম।

ষ্টীমারটার নাম "সাবিত্রী"। আমার সংগে পড়তো একটা ছেলে, নাম সত্যবান। দেখি, সে-ও চলেছে বোটানীক্যাল গার্ডেনে। চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,——"কি রে সত্যবান সাবিত্রীর বুকের ওপর চেপেছিস তো ?"

সে-ও একটু হেসে চেঁচিয়ে বলল,—"আমি একা কেন ভাই ; দুল্‌ছো তো তোমরাও।"

পাশের এক ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন। বোঝা গেল ভদ্রলোকটী সমঝ্‌দার।

ষ্টীমারটায় দারুণ ভীড়। কোন রকমে একপাশে দাঁড়াবার স্থান করে নিয়েছি। খানিক দূরে একটা Anglo মেয়েব পাশে মণিদা' একটা সীট্ Occupy করেছে। ষ্টীমারের সকলেরই দৃষ্টি সাম্‌নের আর একটি Anglo মেয়ের দিকে। মেয়েটির দেহ এবং পোষাক দুই-ই দ্রষ্টব্য বটে। গোটা পাঁচেক রুমালে গিঁট্ দিয়ে দিয়ে বুকটা বাঁধা এবং নিম্নাঙ্গের জাঙিয়া-পরিমান স্থানটুকুও কয়েকটি রঙ্‌চঙে রুমালদ্বারা আবৃত। ব্যস, এই-ই হ'ল মেয়েটির পোষাক। এবং দেহের মধ্যে সবকিছুই সুপরি-স্ফুট এবং সুউন্নত। বোঝা গেল, মেয়েটির পয়সার দরকার এবং পয়সাগুলি স্বোপার্জ্জিত হওয়া চাই। ইংরাজী ছবি দেখেছি অনেক—তাই আঁৎকে উঠ্‌লাম না বটে তবে মুখটা ফিরিয়ে নিলাম। মনে মনে ভাবলাম—"হায় নারী !"

পকেটে হাত দিয়ে দেখি সিগারেট্ নেই। ভীড় ঠেলে আস্তে আস্তে মণিদার দিকে এগুতে লাগলাম, মণিদা' সিগারেট্ খায় না, সিগাব। যাই হোক, একটা সিগারই না হ'য় খাওয়া

যাবে। দূর থেকে দেখি মণিদা' তার পাশের Anglo মেয়েটীর সংগে হেসে হেসে খুব গল্প লাগিয়েছে। আমি যেতেই মেয়েটিকে বললে,—"এই যে, এর কথাই বল্‌ছিলাম। খুব সুন্দর Ronald Colman-কে Copy করতে পারে।"

বোঝা গেল সিনেমার আলোচনা হচ্ছিল। মেয়েটা একটু হেসে আমার দিকে চাইতেই চম্‌কে উঠলাম। আরে, একে যে চেনা মনে হচ্ছে! মেয়েটাও আমাকে দেখে যেন অবাক হয়ে গেল। তারপরই দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, —"কেমন আছ? আমাকে চিন্‌তে পারছো?"

মনিদা' অবাক হয়ে একবার মেয়েটার দিকে আর একবার আমার মুখের দিকে চাইতে লাগ্‌লো।

আমারও তখন মেয়েটাকে মনে পড়ে গেছে। বললাম, —"ওঃ, নিশ্চয়। তোমরা কি এখনো সেই বাড়ীতেই আছ?"

—"হ্যাঁ, এখনো সেই বাড়ীতেই। কিন্তু তুমি তো আর একদিনও গেলে না। তুমি যাকে ঘুষি মেরে ফেলে দিয়েছিলে, সে-ও মাঝে মাঝে তোমার কথা বল্‌তো। প্রায় দু'বছর হ'ল সে কলেরায় মারা গেছে।"

বললাম,—"ওঃ, অত্যন্ত দুঃখের কথা।" একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলাম,—"তুমি কি একা?"

—"না আমার স্বামীও আমার সংগেই আছে। ভীড়ের জন্য বোধহয় ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে। বাগানে নেমে তার সংগে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেবো।"

বললাম,—"ধন্যবাদ।"

মেয়েটার নাম "লিরি স্মার্ট"। প্রায় পাঁচ বছর আগে পরিচয় হয়েছিল হেষ্টিংসের এক রণাঙ্গনে। মেয়েটার অনুরোধে দু'একদিন তাদের বাড়ীতেও গিয়েছিলাম। আর কাল পাঁচবছর পরে তার সংগে দেখা ওই ষ্টীমারে এবং আজ তার পাশে বসে মেট্রোতে সিনেমা দেখ্‌ছি। Interval-এ তার স্বামী, আগামী পরশুদিন তাদের বাড়ীতে আমার চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন।

সিনেমা থেকে ফিরে এসে দেখি লতাতে আর মণিদা'তে দারুণ ঝগ্‌ড়া চলেছে। লতা মণিদা'কে বলছে—"আপনাকে বিয়ে করতেই হবে।" আর মণিদা' বল্‌ছে "রাম কহ, রাম কহ।"

আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে মধ্যস্থ হয়ে লতাকে বললাম,—"নিশ্চয়, মণিদা'কে বিয়ে করতেই হবে।" আব মণিদা'র দিকে ফিরে বললাম,—"নিশ্চয়, কিছুতেই বিয়ে কর্‌বে না।" কথাটা বলে তিনজনেই আমরা একসংগে হেসে উঠলাম। আর সেই সুযোগে মণিদা'র আদরের 'এ্যাল্‌শেশিয়ান্‌' কুকুরটা একলাফে খাটের উপর উঠে পড়ল।

সন্ধ্যার দিকে লিরির বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে তাকে নিয়ে WhiteAwayতে একটা 'স্কার্ট' কিন্‌তে এসেছি।

লিরির স্বামী Mr. Casset বিশেষ কি একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় আমার ওপর লিরিকে নিয়ে 'স্কার্ট' কিন্‌বার আর কালকে তারা duck shootingএ যাবে, তার জন্য কিছু একনম্বর আর দু'নম্বরের শর্ট্‌স্ কিনবার ভার দিয়ে গেছেন। Laidlaw থেকে বেরিয়ে K. C. Biswas-এর দিকে মোড় ঘুরেছি—হঠাৎ দেখি মণিদা' একটি সুশ্রী যুবতীকে পাশে নিয়ে মেট্রোর দিকে এগিয়ে চলেছে। চোখোচোখি হতেই আমাদের দিকে চেয়ে একটু মুচ্‌কি হাস্‌লো, আমরাও হেসে প্রত্যুত্তর দিলাম।

কিন্তু কে ঐ মেয়েটি? মণিদা' আবার কাকে জোটালো? বোধহয় অশ্রুলিখাই হবে। মনে মনে বললাম,—"যাও যাও, পাকা করো।"

লিরির সংগে অতো ঘন হয়ে মেশাটা লতা পছন্দ করছে না। আশ্চর্য্য Conservative মন মেয়েদের। কিংবা হয়তো হবেও-বা ছেলেদের মনটাই বেশী উস্‌খুসে। মেয়েদের মতো তো ছেলেদের আর কেউ এতো study করে না। তাই মেয়ে লতা ওকথা আমাকে বললেও বলতে পারে। মনের অলিগলিগুলো একবার হাত্‌ড়ে দেখলাম। নাঃ, সর্ব্বত্রই লতা, তবে— ; একটা ভাঙা ঘরে ঝাপ্‌সা মাকড়সার জালের মধ্যে কে একটা রয়েছে বটে। দেখা যাচ্ছে শুধু তার চোখ দু'টো। আর এ তো স্বাভাবিকই। একে পুরুষ, তার উপরে

নও-জোয়ান ; আর লিরিও সুন্দরী। যাক্ গে, মনস্থির করে ফেললাম—লিরির সংগে আর দেখা করবো না।

রাত্রি আটটা পঞ্চান্ন, একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘড়ির দিকে চাইতেই মনিদা' এসে ঘরে ঢুক্‌লো—হাতে একটা জ্বলন্ত সিগার। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হে অশ্রুলিখার স্পর্শ মিশিয়ে ছবিটা লাগ্‌লো কেমন ?"

—"অশ্রুলিখা ?" মণিদা' যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে পড়লো।" অশ্রুলিখা কি হে ? ওকে চিন্‌তে পারলে না। তা তুমি কি করে চিন্‌বে বল ? দেখোনি তো আর কখনো ? ওই-ই তো সেই কাবেরী—আমার কাঞ্চনজঙ্ঘা।"

—"কাবেরী ?" চম্‌কে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলাম। "সেই চোরটা ?"

—"হ্যাঁ চোর বটে—তবে শুধু মনচোর, আর কিছু নয়।"

—"তার মানে, তবে তুমি যেসব কথা লিখেছিলে—সে-সব মিথ্যে ?"

—"খুলে না বললে, কিছুই বুঝবি না। চেয়ারে ব'স্—বল্‌ছি সব।"

দুজনে মুখোমুখি—চেয়ার দু'টোকে টেনে নিলাম। ঘড়িতে টং টং করে ন'টা বাজলো। পাশের ঘর থেকে রেডিও-টার অস্পষ্ট আওয়াজ কানে আস্‌ছে ; পঙ্কজের একটা গান হচ্ছে। "আবার যে রে রঙ ফিরেছে—।" মণিদা আরম্ভ করলো;—"কাবেরী সম্বন্ধে বলতে গেলে বেশ খানিকটা আগে

থেকেই বল্‌তে হবে। ব্যাপারটা interesting, rather pathetic—কাবেরী বিবাহিতা। তার স্বামীর নাম রবির্জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। ভদ্রলোককে আমি আগে দেখেছি। ‘গগন বিহারী’ plane-এ যাঁর বইয়ের মধ্যে কাবেবীর ছবি ছিল, তিনিই কাবেরীর স্বামী। ভদ্রলোক মাঝারী বয়স্ক, স্বাস্থ্যবান সুশ্রী চেহারা—চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। এক কথায় চেহারার দিক দিয়ে তিনি কাবেরীর অনুপযুক্ত নন। তাঁর সংগে কাবেরীর ছোটবেলা থেকেই পরিচয় এবং তিনিই কাবেরীকে পছন্দ ক'রে বিয়ে করেন। বিয়ের পরে খুব সুখেই দিন কাট্‌ছিলো। ভদ্রলোক অগাধ ধনী—থিয়েটার, বায়োস্কোপ picnic, হৈ হৈ ; রোজই একটা ক'রে নতুন আনন্দ।”

হঠাৎ লতা এসে ঘরে ঢুক্‌লো।—“কার কথা বল্‌ছেন মণিদা’ ?”

লতার কথার উত্তর না দিয়েই মণিদা বলে যেতে লাগল —“একদিন কাবেরী হঠাৎ ধরে ফেল্‌লে যে, তার স্বামী মদ খেতে আরম্ভ করেছে। কাবেরী তাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করলে ; অনেক রাগ অনেক অভিমান। কিন্তু বিরাট অর্থশালী পিতৃহীন ধনকুবের সে। বুঝতেই পারছ—যা হয় ; মনের ক্ষুধা এবং দেহের ক্ষুধা মেটাতে দু'হাতে তিনি পয়সা ওড়াতে লাগলেন। চোখে তাঁর নতুনের রঙ্‌ লেগেছে কতোদিন আর পুরাণোকে আঁকড়ে থাক্‌বেন ?”

লতা এবার অধৈর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লো,—“বলুন না মণিদা ; কার কথা বল্‌ছেন ?”

—"কারোর কথা নয়, চুপ করে শোন। একটা গল্প বল্‌ছি।" মণিদা আবার বলে যেতে লাগলো,—"একদিন কাবেরী তার স্বামীর জামা গোছাতে গোছাতে জামার পকেট থেকে একটা মেয়ের ছবি পেলে। ছবিটা সে লুকিয়ে রাখলো তার দেরাজের মধ্যে। দু'একদিন তার স্বামী কি একটা খোঁজা-খুঁজি করতে লাগলো। আরও দিন পনরো কেটে গেল কাবেরী বুঝতে পারলো, যে, তার সম্বন্ধে তার স্বামী ক্রমেই indifferent হয়ে যাচ্ছেন। তারপর ক্রমে ক্রমে একদিন একখানি প্রেমপত্র, একদিন বায়স্কোপের টিকিট, এবং পরে পরে Ladies' wrist watch, হাতের রিঙ, মুক্তার মালা ইত্যাদি ইত্যাদি। কাবেরীর মন বিষিয়ে উঠলো তার স্বামীর উপর।"

—"বাবু, মা আপনাদের খেতে ডাক্‌ছেন।" পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে বামুন ঠাকুরের মুখটা দেখা গেল।

—"Nonsense !" মণিদা গর্জ্জে উঠলো।

বললাম,—"বলগে, আমরা একটু পরে যাচ্ছি।"

মণিদা' সিগারেরের ছাইটা ঝেড়ে আবার আরম্ভ করলো, —"একদিন কাবেরীর স্বামী তাকে প্রশ্ন করলেন, যে যদি তিনি আর একটা বিয়ে করেন তাহ'লে কি তার খুব বেশী কষ্ট হবে ?"

—"এঃ কী জঘন্য !"—এবার লতা।

—"আঃ চুপ করো।" মণিদা' ধম্‌কে উঠলো। "কাবেরী সেদিন কোন কথা বলেনি। তারপর সে একদিন দেখলো,

যে তাদের বাইরের ঘরে উপবিষ্টা একটি সুবেশা তরুণীকে তার স্বামী চুম্বন করছেন। মাটির ভিতর থেকে একটা ইলেক্‌ট্রিকের কারেণ্ট কাবেরীর শরীরের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছিল। কোন কথা না বলে সেখান থেকে সে চলে এসেছিল। তার দু'দিন পরে একদিন রাত্রে তার স্বামী তাকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি আর একটি মেয়েকে বিয়ে করছেন। তখন বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কাবেরীর আর কোনই উপায় ছিলনা। সে অবশ্য তার বাপের বাড়ীতেও যেতে পারতো, কিন্তু প্রথমতঃ তার স্বামীদ্বারা কলঙ্কিত মুখ সে কোনমতেই সেখানে দেখাতে পারে না। আর দ্বিতীয়তঃ, সে পিতৃমাতৃহীনা এবং তার কাকাবাবু অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির লোক। সুতরাং বাপের বাড়ীতে তার স্থান হ'তো না। তাই সে পালিয়ে গিয়েছিল দিল্লী। এবং পরে তার স্বামী বিবাহ প্রস্তাব পরিত্যাগ করায় এবং কাবেরীর উপর কৃত ব্যবহারের দরুণ অনুতপ্ত হওয়ায় নিঃসহায় কাবেরীকে আবার ফিরে আসতে হয়েছে। রবির্জ্যোতিবাবু সেদিন প্লেনে তাকেই খুঁজতে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরছিলেন—কাবেরী তখন বৃন্দাবনে।" কি একটা কাজে লতা ঘর থেকে চ'লে গেল। মণিদা' একটা ভরপুর আনন্দের নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌লে, "তাকে আমি আবার পেয়েছি, আবার ভালো বেসেছি। ও রকম মেয়ে আমি আর কোথাও দেখিনি। ঠিক এই রকম মেয়েই আমি চেয়েছিলাম। কাবেরীকে আমি ভুল বুঝেছিলাম, সে-ই ঠিক আমার কল্পনার নারী। সে চোর নয়, চুরি করেনি। সে নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ।"

এবার মা এসে ঘরে ঢুকলেন।—"কি রে, তোরা খাবিনা ? বাড়ী শুদ্ধু সকলের যে খাওয়া হয়ে গেল।"

বললাম,—"চল মা, যাচ্ছি। মণিদা' চল, ওঠা যাক্।"

আবার আজ লিরির বাড়ীতে এসেছি। লিরির স্বামী আজকেও কি একটা কাজে বেরিয়ে গেলেন। এখন রাত্রি আটটা। বাইরের ঘরে তুজনে মুখোমুখি বসে গল্প কর্‌ছি। লিরির তু'বছরের ছেলটা একটা পিঙপঙ-এর বল নিয়ে খেলা করতে করতে ঘরে ঢুকে আমাকে দেখেই আবার ঘরের বাইরে চলে গেল।

আবার এসেছি। কী একটা অদৃশ্য টানে আবার আসতে হয়েছে লিরির কাছে। কথা হচ্ছিল মেয়েদের সৌন্দর্য্য নিয়ে। আমি বলছিলাম, মেয়েদের নগ্নসৌন্দর্য্যের চেয়ে অতি অল্প পাৎলা বসনাবৃতা নারীই বেশী attractive। হঠাৎ ঘরের আলোটা নিভে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম—"আলোর স্থইচ্‌টা কোনদিকে ? নেভালো কে ?"

—"সেটা ঘরের বাইরে, আর স্থইচ্‌টা কেউ বন্ধ করেনি। লাইনটাই ফিউজ্ হয়েছে বোধহয়। কিন্তু থাক্‌না, এইটেই তো বেশ। আবার আলো কেন ?"

অন্ধকারে আবছা ছায়ার মতো লিরির মুখটা দেখা যাচ্ছে। পকেট থেকে তুটো সিগারেট্ বার করে একটা লিরিকে দিয়ে আর একটা নিজে নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম,—"অন্ধকারে

বসে কী হবে? তার চেয়ে চলো একটু বেড়িয়ে আসি।” লিরির কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

দেশলাই জ্বেলে লিরির দিকে কাঠিটা বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু তার মুখে সিগারেট্‌টা তখন নেই। দেশলাই-এর অল্প আলোয় দেখতে পেলাম তার দৃষ্টি আমার দিকে স্থির। কিন্তু লিরির ওরকম চাহনী তো আমি আর কখনো দেখিনি! সেই মদালস ক্লান্ত চাহনী যেন আমাকে সম্মোহন করতে চায়।

…কাঠিটা নিভে আস্‌ছে, লিরির মুখটাও এগিয়ে আসছে।

চেয়ারের সংগে সিমেণ্টের মতো জমে গেছি। দেহের রক্ত উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

…কাঠিটা নিভে গেল। অন্ধকারে, ঝাপ্‌সা ছায়াটা একেবারে কাছে এগিয়ে এসেছে। মুখে লাগ্‌ছে উষ্ণ নিশ্বাস। একটা মিষ্টি Hair cream-এর গন্ধ। চোখ বন্ধ করলাম। ঠোঁটে লাগলো আল্‌তো ঠাণ্ডা স্পর্শ।

হঠাৎ ঘরের আলোটা জ্বলে উঠ্‌লো, চম্‌কে আমরা দু'জনে সরে বসলাম। দরজায় মিষ্টার ক্যাসেটের দেহ।

সন্ধ্যার একটু আগে আফিস থেকে ফিরে এসেছি। বসে বসে কালকের কথাই ভাবছি। একবার মনে পড়ছে লিরির শুক্‌নো পাণ্ডুর মুখটা আর তার পরক্ষণেই ফুটে উঠ্‌ছে ক্যাসেটের স্থির ছবি।

আমার তো কোনো দোষ ছিল না, ছি ছি কি কেলেঙ্কারী। কিন্তু আমাদের মধ্যে কী এমন ব্যবহার ক্যাসেট

লক্ষ্য করেছিলেন যে জন্যে তিনি বাইরে থেকে আলো নিভিয়ে আমাদের পরীক্ষা করছিলেন।

লতা এসে ঘরে ঢুক্‌লো। "তোমার কি হয়েছে বলো তো? সকাল থেকে মুখ গম্ভীর করে বসে আছো। কাল রাত্রে ভালো করে খাওনি, আমার সংগে ভালো করে কথা বল্‌ছো না; কী হ'ল কি!"

—"কিছু না; পাকিস্থানে বেশ কিছু টাকা আট্‌কে রয়েছে—সেই কথাই ভাব্‌ছি।"

……"সবুজ নীলেতে ঐ মেশা
এসো আজ সীমান্তের গাই"

গান গাইতে গাইতে গাইতে মণিদা' এসে ঘরে ঢুকলো। "কিরে তোরা ছ'জনে কী কর্‌ছিস্? ব্যাঘাত করলাম নাকি? 'কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ নীড়ে' থুড়ি ছুটি সোফা জুড়ে।" পকেট থেকে ছ'টো লজেন্স বার করে মণিদা' আমাদের দিকে ছুড়ে দিলে।

মণিদা'কে আজকাল আর দেখতেই পাওয়া যায় না। সকাল সাতটার সময় কাজে বেরিয়ে যায়। আর বিকেলে কাজ সেরে সটান কাবেরীর বাড়ী। রাত্রি নটা পর্য্যন্ত কাবেরী আর রবির্জ্যোতিবাবুর সংগে কাটিয়ে বাড়ী ফেরে। তারপর রাত্রের আহার সেরেই নিদ্রা।

দরজার পর্দ্দাটা হঠাৎ নড়ে উঠ্‌লো। আর দরজা দিয়ে

ঘরের ভিতর গলে এলো মণিদার শরীরটা। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—"আজ যে এতো শীগ্‌গীর্? কাঞ্চনজঙ্ঘা কী আজ দুর্লঙ্ঘ্য নাকি?"

—"না শরীরটা আজ বেতালা হয়ে গেছে। বোধহয় জ্বর এসেছে।"

মণিদা'র কপালে হাত দিয়ে দেখি আগুনের উত্তাপ বেরুচ্ছে। থার্ম্মোমিটারে জ্বর উঠ্‌লো আড়াইয়েরও উপর।

লতা তাড়াতাড়ি খবরটা মাকে শোনাতে গেল, যেন কি একটা আনন্দের সংবাদ অর্থাৎ মণিদা'র জ্বর হয়েছে বেশ হয়েছে! যেমন বাইরে বাইরে ঘোরা—আমাদের সংগে কথা বল্‌বেনা, কিচ্ছুনা, ঠিক্ হয়েছে!

বললাম,—মণিদা' যাও ঘবে গিয়ে শুয়ে পড়ো, তোমার জন্যে গরম দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠ্‌লো। মণিদাই গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলে। "হ্যালো—হ্যাঁ আমিই।"

দূরে চেয়ারে বসে মণিদা'র মুখটা লক্ষ্য করতে লাগলাম। মণিদা'র হাল্কা হাসিভরা মুখটা ক্রমেই গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। মণিদা হঠাৎ একটা অস্ফুট চীৎকার করে উঠ্‌লো। তারপরেই "আমি এক্ষুনি যাচ্ছি" বলে রিসিভারটা নামিয়ে রেখেই আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে,—"রবির জন্যে লুচি তৈরী করতে গিয়ে ষ্টোভ ফেটে কাবেরী পুড়ে গেছে; আমি এখনই চললাম।"

—"কিন্তু তোমার যে শরীর অসুস্থ, এতো জ্বরে—।"

—"Fool!" এক লাফে মণিদা' ঘরের বাইরে চলে গেল আমার বাধা দেবার আগেই।

এরকম চঞ্চল, এরকম বিচলিত অবস্থা মণিদার আর কখনো দেখিনি। ব্যাপারটা এমনই হঠাৎ ঘটে গেল যে কিছুই ভাববার সময় পেলাম না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম দরজায় ঝোলানো আলোড়িত পর্দ্দাটার দিকে চেয়ে।

রাত্রি এখন প্রায় দশটা। লতা আর আমি বাইরের ঘরে মণিদার জন্য অপেক্ষা করছি। ঘটনাটা এমনই আকস্মিক ঘটেছিল যে এখনো পর্য্যন্ত আমরা ঠিক করে বুঝে উঠ্‌তে পারিনি। লতার তো কথাই নেই। সে বেচারা ভেবেই অস্থির। মা-বাবাকে কোনরকমে ঠাণ্ডা করে রেখেছি। বলেছি,—"অফিসের কী একটা বিশেষ জরুরী কাজে এই জ্বরের উপরেও তাকে বেরুতে হয়েছে।"

মনে মনে ভাবছিলাম, কাবেরী যে মণিদা'র এতোখানি তা তো কই এতোদিন ধরা পড়েনি। আজকের ব্যাপারটা দেখে মনে হল, কাবেরী যেন মণিদারই আর একটা অংশ। কাবেরী পুড়ে গেছে, যেন মণিদা'রই একখানা হাত।

লতাকে বললাম,—"জানো লতা, ভালোবাসা যে কতো গভীর হতে পারে, তা তোমার ধারণাই নেই। ভালোবাসা, ভগবানের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! সবকিছু সুখদুঃখের মূলে আছে এই ভালোবাসা মানুষ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যেই এর স্থান আছে। তবে মানুষের সম্বন্ধে ভালোবাসার—" হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়্‌ল। লতা তাড়াতাড়ি

দরজা খুলে দিলে। ঘরের মধ্যে টল্‌তে টল্‌তে এসে ঢুক্‌লো মণিদা’।

চম্‌কে উঠলাম মণিদা’র দিকে চেয়ে। একি চেহারা মণিদা’র? চোখ জবাফুলের মতো টক্‌টকে লাল। চুল-গুলো উস্কখুস্ক। কপালের শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে উঠেছে।

ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে মণিদা চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়ালো।—“উঃ বীভৎস, বীভৎস! সেই মুখ, সেই পদ্মফুল জ্বলে গেছে—একেবারে জ্বলে গেছে।” মণিদা’ চেয়ারে বসে পড়্‌ল।

মণিদা’র কপালে হাত দিয়ে আন্দাজ করলাম, জ্বর প্রায় পাঁচেরও উপর। চেয়ার থেকে তুলে তাকে খাটের উপর শুইয়ে দিলাম। খাটের উপর শুয়েই মণিদা অচৈতন্য। তার চোখের কোণ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছে গালের উপর। আঁচল দিয়ে লতা জলটা মুছে নিলে।

আজ সকালে মণিদা’ বেশ ভালই আছে। কাল রাত্রেই ডাক্তার এসেছিল, ম্যালেরিয়া ব’লে গেছে। Injection আর Mixture তুই-ই চল্‌ছে। জ্বর আর নেই।

আমি, লতা আর মণিদা’ আমরা তিনজনে মণিদা’র ঘরে ব’সে কথা বল্‌ছি। লতা কাবেরীর ব্যাপার সবই জেনে গেছে।

মণিদা’ বল্‌ছিল—“কাল রাত্রে কাবেরী ভীষণভাবে পুড়ে

গেছে শুনে আমি তো তক্ষুনি বেরিয়ে গেলাম। সেখানে যেতে রবি আমায় কাবেরীর ঘর দেখিয়ে দিলে। আমি সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরটা অন্ধকার, শুধু একটা ফিকে নীল-আলো জ্বল্‌ছে। ঘরে ঢুকতেই কাবেরী বলে উঠলো,—'তুমি এসেছো, আমি তোমারই প্রতীক্ষা কর্‌ছিলাম, বস ঐ চেয়ারটায়।' দূরে খাটের উপর কাবেরী শুয়ে আছে। সমস্ত দেহটা একটা চাদরে ঢাকা, আব্‌ছা দেখা যাচ্ছে। খাট থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা চেয়ার—সেই চেয়ারে গিয়েই বসলাম। জিজ্ঞাসা কবলাম, 'এখন কী রকম আছ?' বল্‌লে,—'ভালই, কিন্তু তুমি আজ সন্ধ্যাবেলায় এলে না কেন?' বললাম,—'আমার জ্বব হয়েছে।' চম্‌কে উঠে কাবেরী বল্‌লে,—'জ্বর হয়েছে? তবে তুমি এলে কেন? না-না, এ তোমার ভারী অন্যায়।' হঠাৎ কাবেরীর মুখটা আমার খুব দেখতে ইচ্ছে হ'ল। পাশেই আলোর সুইচ্‌ ছিল। চেয়ার থেকে উঠে জ্বাল্‌তে যেতেই কাবেরী চীৎকার করে উঠ্‌লো,—'আলো জ্বেলোনা, আলো জ্বেলোনা।' কিন্তু তখন আমি আলো জ্বেলে ফেলছি। হঠাৎ একটা আর্ত্তনাদ ক'রে দু'হাত দিয়ে কাবেরী তার মুখটা ঢেকে ফেললো। বললাম,—'কাবেরী, তোমার মুখ যত কুৎসিতই হয়ে যাক্‌, কিন্তু তবু সে তো তোমারই মুখ!' একটু চুপ করে থেকে কাবেরী তার মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বল্‌লে,—'সত্যি, তোমার কাছে গোপন করবার আমার কিছুই নেই।' কিন্তু সে যে কী বীভৎস—তুই তো কাবেরীকে দেখেছিস্‌, বল সে কি সুন্দরী নয়?"

বললাম,—"প্রকৃতই, ওরকম সুন্দরী খুব কমই চোখে পড়ে।"

—"কিন্তু জানিস রে, তার সেই মুখ আজ দেখলে ভয় করে। তার সেই মুখখানির কোন চিহ্নই আজ অবশিষ্ট নেই। সে জ্বলে গেছে, পুড়ে গেছে—আর সংগে সংগে আমাকেও পুড়িয়েছে।" মণিদা'র চোখ ভরে জল টলটল করছে; বোধহয় পাতা ফেললেই গড়িয়ে পড়বে।

এখন বিকেল চারটে। অফিসে এসেছি। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। বাবা আর কাকা এখনো কাজে ব্যস্ত। প্রাইভেট্ চেম্বারে একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে চোখ বুজে একটু বিশ্রাম করছি। ঘরে এসে ঢুকলো আমার এক বন্ধু—অসীম রায়। হাতে তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা'। জিজ্ঞাসা করলাম,—"কোথা থেকে ?"

—"এই একটু এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম, দেখা করে যাই।" অসীম একটা চেয়ার দখল করল।

বলালম,—"তা বেশ ; একটা কিছু নতুন খবর টবর বল।"

—"নতুন খবর ? নতুন খবরের মধ্যে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'। বইটা পড়েছিস্ ? বইটা লিখে তারাশঙ্করবাবু স্বর্ণপদক পেয়েছেন।" অসীমের চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি।

বললাম,—"পড়েছি। ভদ্রলোকের ক্ষমতা আছে। তবে, নেহাৎই একটা Psychological bluff। অবশ্য ব্লাফে স্বর্ণপদক পাওয়াটাও একটা বাহাদুরী বটে।" বইটা পড়ে

আমার বল্‌তে ইচ্ছে হয়েছিল 'কত অঙ্গই (রঙ্গই) দেখালি মাসী' একটু থেমে বল্‌লাম,—"আর ভাই আজকালকার অনেক সাহিত্যিকেরই লেখা পড়ছি তো? দেখ্‌ছি তাঁরা যে নেবু-গুলোকে চট্‌কাচ্ছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র 'পাঁকেতে' অনেক আগেই সেগুলোকে চট্‌কে দিয়েছেন। সুতরাং, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, বাঁড়ুয্যে ইত্যাদিরা বেশীরভাগ লেখার মধ্যেই 'পাঁকের' চর্ব্বিত-চর্ব্বন করছেন। অবশ্য এখানে আমি তারাশঙ্করবাবুর 'হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা'কে mean করে কিছু বলছি না। যাই হোক্, এখন তুই কি খাবি বল দেখিনি?"

"Nothing. You can offer me only a cup of tea." অসীম ডান হাতের কড়ে আঙ্গুল তুলে দেখালে।

বেয়ারাকে ডেকে এক কাপ চা আনতে বলে দিলাম।

—"বুদ্ধদেবকে তোমার কেমন লাগে? পড়েছো তাঁর 'বন্দীর-বন্দনা'?"

বললাম,—"বুদ্ধদেবকে আমার ভালই লাগে। কিছুটা বস্তু তার মধ্যে আছে। কিন্তু 'বন্দীর-বন্দনায়' অমিতার একটু প্রেমের জন্যে বুদ্ধদেববাবুর ছিঁচ্‌কাঁদুনী আমি মোটেই সহ্য করতে পারিনি। নেহাৎই ছেলেমানুষী rather idiotic. যাযাবর 'দৃষ্টিপাত'এ আধারকারের মুখ দিয়ে বলিয়ে গেছেন যে "প্রেমে পড়লে চেহারাটা বড্ড বোকা-বোকা দেখায়।" বুদ্ধদেববাবু প্রেমে পড়েছেন অথবা পড়েননি, তা আমি জানিনা; এবং যদি তিনি পড়ে থাকেন তা হ'লে তাঁকে

বোকা-বোকা দেখাচ্ছিল কি না তাও জানিনা কিন্তু 'অমিতার প্রেমে' তিনি নেহাৎই বোকা বনে গেছেন, অথবা কবিতাটি যাদের ভালো লেগেছে তাদের বোকা বানিয়েছেন।"

ঘরে ঢুকলো অফিসের এক কর্ম্মচারী, একটা চিঠি সই করাতে। চিঠিটা সই করিয়ে ঘর থেকে সে চলে গেল।

—"বুদ্ধদেব যদি এই রকম বাজে ছিঁচ্‌কাঁদুনে কবিতা লেখে, তা হ'লে তাঁকে তোর ভালো লাগে কেন?" অসীম প্রশ্ন করলো।

বললাম,—"দেখ্, বুদ্ধদেবের একটা কবিতা ভালো লাগেনি বলে তাঁর যে লেখাগুলো ভালো লেগেছে সেগুলোও তো আর খারাপ বলতে পারিনা। তাঁর 'হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি' বা 'উত্তর তিরিশ' পড়ে ভালো না বলবার কোন মানেই হয় না। আর 'অমিতার প্রেম' কবিতাটি তাঁর কাঁচা বয়সের লেখা। শুধু বুদ্ধদেবই বা বলি কেন? অনেক ভালো লেখকও এমন সব বাজে কথা লেখেন যার কোন মানেই হয় না, যেমন জ্যোতির্ম্ময় রায়ের 'দৃষ্টিকোণ'-এ 'নবযুগ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন যে "মানুষ যদি লিখ্‌তে না পারতো তা হ'লে হ্যাণ্ডবিলের কিচিরমিচির শুন্‌তো" অর্থাৎ মানুষ যদি খেতে না পারতো তা হ'লে ছোলা ভাজা খেয়ে পেট ভরাতো। এই রকম কথা আর কি।"

এক কাপ চা হাতে বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকলো!

সাড়ে পাঁচটার সময় চাং-ও-আ-রেস্তোরাঁতে একটা engagement আছে, কোন একটি জাহাজী কোম্পানীর অফিসারের সংগে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম সওয়া পাঁচটা। অফিস থেকে সোজা চলে গেলাম চাং-ও-আয়। বাইরেটায় তাকে না দেখতে পেয়ে পর্দ্দা ঝোলানো কাঠের পার্টিশন দেওয়া ঘরগুলোর ভেতর একবার করে উঁকি মার্‌তে লাগলাম। হঠাৎ একটা পর্দ্দার ফাঁকে চোখ পড়তেই চম্‌কে উঠলাম্। আরে! সত্যবানের সংগে লিরি!

আমাকে দেখতে পেয়েই জড়িয়ে জড়িয়ে লিরি জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—"Hallo boy! How are you keeping?" মাথাটা তার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল, বেসামাল হাত লেগে কাঁচের গ্লাসটা মাটিতে পড়ে ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে গেল। মেজেতে খানিকটা মদ ছড়িয়ে পড়ল।

দারুণ বিস্মিত হয়ে সত্যবান্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম,—"এর সংগে আলাপ হ'ল কী করে? কোথায় পেলি একে?"

ডানদিকের ভুরুটা তুলে একটু অবজ্ঞার সংগে সত্যবান বললে,—"একে আর পাওয়াপাওয়ি কি?" "এরা সব রূপোর মধুর মৌমাছি। চাঁদি ফেলো, ওমনি দেখবে উড়তে উড়তে চ'লে আসচে—তবে এরা একটু Privately." টেবিল থেকে পেগের গ্লাসটা সে তুলে নিল।

চোখের সামনে সব যেন কেমন অন্ধকার হ'য়ে লিরির মুখটা ঝাপ্সা হয়ে মিলিয়ে গেল। ঘরটা একবার দুলে উঠল। অফিসারের সংগে আর দেখা করা হ'লনা। প্রায় একরকম

ছুটেই হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে মোটরে Start দিলাম। ষ্টিয়ারিং হাতের মধ্যে কাঁপতে লাগলো।

আজ শুক্রবার। অফিসের কাজে বাধ্য হয়েই আস্তে হয়েছে। বুকের মধ্যে যেন হাজার হাজার দীর্ঘনিঃশ্বাস ভীড় করে ধাক্কাধাক্কি কর্ছে। এ রকম চঞ্চল মন নিয়ে কাজ করা যায় না। চোখের সামনে খালি ভেসে বেড়াচ্ছে চাং-ও-আর পার্টিশন্ দেওয়া ঘরটা। সত্যবানের কথাগুলো যেন বারবার কানের পর্দ্দায় এসে আঘাত করছে—"এরা সব রূপোর মধুর মৌমাছি।"

অফিসের ড্রয়ার খুলতে গিয়েই চম্‌কে উঠলাম। যাঃ চাবী? চাবী আন্‌তে ভুলে গেছি? এতোখানি অবনতি?

...একজন কর্মচারীকে ডেকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম চাবী আনবার জন্য।

অবশ্য-করণীয় কাজগুলো সেরে বাড়ী ফিরে এলাম সাড়ে তিনটার সময়। ঘরে ঢুকতেই মণিদার সংগে দেখা। বল্‌লে, —"কি রে? এতো তাড়াতাড়ি?"

মনে মনে ঠিক করেছিলাম বাড়ী ফিরে মণিদাকে আজ সব বলবো। বললাম,—"মণিদা, আজ তোমাকে অনেক কিছু বলবো। একজনকে না বল্‌লে যেন মনের বোঝা খানিকটা হাল্কা করতে পারছি না। অন্ধকারে হারিয়ে গেছি। পথ দেখাও, আলো দাও।"

আমার কথাগুলো শুনে মণিদা যেন কেমন একটু হয়ে গেল। খাটের উপর সোজা হয়ে উঠে বসে বললে,—"কিরে, কী হয়েছে? অমন কাৎরাচ্ছিস্ কেন?"

চেয়ারটাকে মণিদার খাটের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে লিরি-সম্বন্ধীয় কথাগুলো একের পর এক সব খুলে বললাম।

সব কথা শোনার পর খাটের উপর সটান লম্বা হ'য়ে মণিদা আবার শুয়ে পড়ল। তারপর ধনুকের মতো বেঁকে একটা আলস্য ভেঙে বল্লে,—"ওঃ এই? এতে আর হয়েছে কি?"

বল্লাম,—"না মণিদা, তুমি বুঝতে পারছো না। আমি একটা বিরাট পাপ করেছি—।"

—"চুপ।" কথার মাঝেই মণিদা ধমকে উঠলো। "কোনটা পাপ আর কোনটা পাপ নয় তা তুই বুঝিস্?"

"কিন্তু—।"

—"লতাকে তুই সত্যি ভালোবাসিস্?"

—"বিশ্বাস করো মণিদা—লতা আমার প্রাণের চেয়েও বড়ো—।"

—"থাম্, বড়ো বড়ো কথা রাখ। লতাকে তুই তাহ'লে এখনো—একই রকম ভালোবাসিস্?"

—"হ্যাঁ।"

—"ব্যাস্। তা হ'লে যা বলি শোন্। হ্যাঁ, তুই যে অপরাধ করেছিস্ সেটা সত্যি। কিন্তু তবু তোর সে অপরাধের গুরুত্ব কম। কারণ সেটা তোর ক্ষণিক মোহ। সাময়িক

উত্তেজনার ফলে মানুষ অনেক কিছুই করে ফেলে। কিন্তু করে ফেলার পর সেটাকে মানিয়ে নিতে হয়। তবে তুই যেটা করে ফেলেছিস্ সেটা শুধু উত্তেজনা নয়, খানিকটা ইচ্ছাও ছিল। তার জন্যে দায়ী করা যায় তিনটি অবস্থাকে। তোর বয়সকে, opportunityকে আর তোর romantic মনকে। আমার মনে হয় তুই যদি তোর স্বাধীন ইচ্ছাকে জোর করে দমন করতিস্ তাহ'লে তোর সেই অবদমিত ইচ্ছা তোর unconscious mind-এর মধ্যে লুকিয়ে থেকে হয়তো আরো বিশ্রী ভাবে প্রকাশ পেতো। সেটা আরো খারাপ হতে পারতো। কিন্তু আমি একথা বল্‌ছিনা যে যখনি যেটা ইচ্ছা সেইটেই করতে হবে। তুই যখন এ ধরণের ভুল করেছিস্ সেই জন্যেই আমার বলা—। যা করে ফেলেছিস্, মনে মনে ভাব ওটা কিছুই নয়, ও রকম হয়েই থাকে। তবে ভগবানের বিরাট আশীর্ব্বাদ যে লিরি গণিকা। আর সেটা তুই সময় থাকতেই জানতে পেরেছিস্। যাই হোক, সিনিয়রিতার কাছেও তোর সব কথা খুলে বলা উচিৎ। তুই নিজের কাছে যে অপরাধ করেছিস্—তার চেয়ে বেশী অপরাধ করেছিস তাঁর কাছে। তবে তিনি বুদ্ধিমতী ; তাঁর কাছে ক্ষমা পেতে তোর দেরী হবে না।'

—"কিন্তু মণিদা, এ সব কথা তাঁর কাছে আমি কোন মুখে বলবো ?"

—"এঁঃ, ন্যাকামী—। যখন পাপ কর্‌ছিলে তখন মনে হয়নি ? যদি একমাত্র কারুর কাছে বলতে পারিস্—সে তোর

লতা। যা, সবকথা অকপটে বলে তাঁর কাছে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কর।" চাকরকে ডেকে মণিদা দু'কাপ চা আনতে বলে দিলে।

বল্‌লাম—"বেশ, তোমার কথামতো আজ রাত্রেই লতাকে সব বলবো।"

...মণিদার কথাগুলো শুনে বেশ শান্তি পেলাম। আশ্চর্য্য মণিদার মন। আমার এমন অপরাধের কথা শুনেও সে বিশেষ কিছু মনে করলে না, উপরন্তু বললে,—'ও রকম একটু আধটু সকলেরই হয়ে থাকে, ওটা এমন কিছু দোষনীয় নয়।' মনে মনে নিজের চরিত্র বিশ্লেষণ করে সত্যিই যেন বুঝতে পারলাম, মণিদা একটা অদ্ভুত ছেলে।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় লতার কাছে আমার বক্তব্য সব শেষ হ'ল। আমার কথাগুলো শুনে লতা যেন পাথরের মূর্ত্তির মতো নিশ্চল হয়ে গেল। ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখের মধ্যে চোখটা যেন বার কয়েক চিক্‌চিক্ করে উঠলো! লতার এরকম অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললাম। লতার হাতটাকে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্‌লাম,— "ক্ষমা করো, ক্ষমা করো লতা। আমার ভুল তো আমি বুঝতে পেরেছি। মণিদাও আমাকে ক্ষমা করেছে—।"

হঠাৎ দুম্ দুম্ করে দরজায় ধাক্কা পড়ল। সংগে সংগে মণিদার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, "দরজা খোল্।"

দরজা খুলতেই ঘরের মধ্যে সস্মিত মুখে প্রবেশ করল মণিদা—"কী হ'ল? রিতা বোধ হয় Nervous হয়ে গেছে,

না? তোর কথা শুনে ও যে Shocked হবে তা আমি জানতাম্। কিন্তু তবু ওকে না জানালে হয়তো আমাদের পাপ করা হত—।”

মণিদা আস্তে আস্তে লতার দিকে এগিয়ে গেল—“ছিঃ, রিতা, তোমাব মতো মেয়ের লঘুচিত্ত হওয়া উচিত নয়। Be broad minded, তোমার স্বামীর শুধু মনের গতির সংগে Capacity-Compass-টার ধাক্কা লেগে বৃত্ত হয়তো একটু বড়ো হয়ে গিয়েছিল—কিন্তু কেন্দ্র ঠিকই আছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারো।”

আশ্চর্য্য! মণিদার কথা শুনে লতার যেন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হ'ল। আমার এতো আকুতিতে যা সম্ভব হয়নি, মণিদার সামান্য কয়েকটা কথায় সেটা যেন জল হয়ে গেল এমনই মণিদার পরিচয়।

লতা মণিদাব দিকে চেয়ে বললে,—“আপনার কথা আমি অবিশ্বাস কবতে পারি না। আমারই হয়তো calculation-এ ভুল হয়েছে' তবে আমার calculationও যে একেবারে অস্বাভাবিক তা নিশ্চয়ই আপনি বলবেন না।”

—“না, ঠিক তা নয়; তবে এ ধরণের calculation করে কোন কিছুর definite সিদ্ধান্তে যাওয়া উচিৎ নয়। আমারও ঠিক এমনই ভুল হয়েছিল।” বলতে বলতে মণিদা যেন হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

হঠাৎ মনে পড়ল কাবেরীর কথা, জিজ্ঞাসা কর্‌লাম,—“হ্যাঁ, রবিবাবুর স্ত্রীর খবর কি?”

—"Telephone করেছিল, আমাকে যেতে বলেছে।" তারপর মণিদা দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল।—"Alright, goodnight, both of you. Wish you undisturbed sleep."

লতা আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেল্‌লো।

আজকে শনিবার। অনেক আগেই অফিস থেকে চলে এসেছি। মণিদা' আজ বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। লতা আবার normal হ'য়ে এসেছে।

লতার আব্দার আর মণিদা'র হুকুমে আজ আমায় লতাকে নিয়ে সন্ধ্যার শো'তে সিনেমায় যেতে হবে। মনটা আজকে অনেকটা ভালো। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। খুব বেঁচে বেরিয়ে এসেছি লিরির হাত থেকে। "ছি, ছি, শেষে কিনা একটা বেশ্যার সংগে—!"

সন্ধ্যার দিকে লতাকে নিয়ে বেরোলাম ভবানীপুরের পথে। ঠিক "Dwarik's Sweets"-এর সাম্‌নে এসে আমার মোটরের সংগে আর একটি মোটরের একটু ঠেকাঠেকি হয়ে গেল। চম্‌কে ষ্টিয়ারিংটা কাটিয়ে নিলাম। বাম্পারটা একটু চিড় খেয়ে গেল।

হঠাৎ লতা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"ওমা দেখ দেখ, সন্ধ্যারাণী।"

দেখি, যে গাড়ীটার সংগে ধাক্কা লাগ্‌লো সেই গাড়ীটারই জানালার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছেন আপনাদের

সন্ধ্যারাণী। স্বগতোক্তি করলাম "Grapes are sweet" তারপর লতার নাকটা একটু নেড়ে দিয়ে বললাম "Sweet grape"

রাত্রি নটায় সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরে এলাম।

মণিদা জিজ্ঞাসা করল,—"কেমন দেখ্‌লি?"

বললাম,—"দেখ্‌বো আর কী? দেখলাম সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' 'অঞ্জনগড়ে' ফসিল প্রাপ্ত হয়েছে—আর সুনন্দা দেবী অবিবাহিতা যুবতী মেয়ের পার্ট করবেনই। তিনি নাছোড় বান্দা!"

আজ রবিবার। অফিসের তাড়া নেই। সুতরাং একটু দেরী করেই বিছানা ত্যাগ করলাম। রবিবারে বাইরের ঘরে আমাদের আড্ডা বসে। দু' একজন বাইরের বন্ধু এবং বাদবাকী নিজেদের মধ্যে। ছুটীর দিনের সকালটুকু এই জন্যই লোভনীয়।

তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে নীচে নেমে এলাম। আজকের চা-টা আমরা সকলে এক সংগে এই ঘরেই শেষ করি।

আড্ডা বসেছে। আজকের এই আড্ডাকে আমরা বলি—"চালোচনাসর" অর্থাৎ চা মিশিয়ে আলোচনার আসর। এমন কোন আলোচনা নেই যা এখানে তুলতে পারা যায় না। ফুটবল, রাজনীতি, সিনেমা, সাহিত্য, প্রেম ইত্যাদি সব কিছু।

'চালোচনাসরে' ঢুকে কিন্তু মণিদা'কে দেখতে পেলাম না। কেউ-ই বলতে পারলে না তার খবর। শেষে একটা চাকরের

কাছে খবর পাওয়া গেল যে সকাল ছ'টার সময় কার একটা ফোন পেয়েই মণিদা' বেরিয়ে গেছে। কী আর করি, আসরে গিয়ে যোগ দিলাম। আসরের প্রথম আলোচনা তুললো বিকাশদা' মানে মণিদা'র এক ক্লাসফ্রেণ্ড। তার আলোচনা হ'ল—এখনকার মধ্যে কোন লেখকের স্থান সবচেয়ে উঁচুতে দেওয়া যায় এবং কেন ?

আলোচনার কথাগুলো এখানে আর তুলে দিলাম না। কারণ বিকাশদা'র মুখ একটু আল্গা এবং যখন তিনি কোন সাহিত্যিককে কারোর সংগে Comparison ক'রে inferior prove করবার চেষ্টা করেন তখন তার জিভ্ টা একটু বেশী মাত্রায় অসংযত হ'য়ে পড়ে। যাই হোক্ শেষ পর্য্যন্ত আমরা সকলে মিলে একজনকে সিংহাসনে বসালাম।

এইবার আলোচনা তুললো মধুব্রত—আমার খুড়তুতো ভাই।—"সব মানুষ যদি সব মানুষের মনের কথা জানতে পারতো তা হ'লে কী হ'ত।"

আমি বললাম,—"Absurd."

বিকাশদা' বলল,—"রূপকথা।"

দীনেশ খুড়ো বললেন,—"ক্যাবলামি।" তিনি আমাদের Common খুড়ো।

মধুব্রত এবার বলল,—"মোটেই নয়, সব মানুষ যদি সব মানুষের মনের কথা জান্‌তে পারতো তা হ'লে কেউ-ই কাউকে বিশ্বাস করত না।"

বললাম,—"পৃথিবীটাকে অত কলুষ দেখো না ভায়া,

আসল কথাটা কি জান ? সকলেই যদি সকলের মনের কথা জানতে পারতো তা হ'লে সকলে এতো জেনে ফেলতো যে তাদের কিছুই জানা হ'ত না এবং তোমার মত একটি গবেট তৈরী হত।"

মধুব্রত কি একটা বলতে গেল। কিন্তু আসর-ভাইদের উচ্চহাস্যে তার ক্ষীণ কণ্ঠ ডুবে গেল।

এইবারের আলোচনা আরম্ভ করলেন খুড়োমশাই।—"ভগবান বলতে তোমরা কী বোঝ ?"

বিকাশদা' বললে,—"ভগবান বলতে আমরা ভগবানকেই বুঝি।"

বললাম,—"বন্ধ করুন। আজকের আলোচনা মোটেই ভালো হচ্ছে না। মণিদা' না এলে কেউ-ই জমাতে পারছে পারছে না। তার চেয়ে আসুন কয়েকহাত Bridge খেলা যাক। সকলে রাজী আছেন ?"

—"হ্যাঁ নিশ্চয়, নিশ্চয়।" সকলে এক সংগে।

…খেলা সুরু হ'ল। Partner আমি আর বিকাশদা', খুড়োমশাই আর মধুব্রত।

—"Three Spades" Call open করল বিকাশদা'।

প্রায় বারোটা বেজে গেছে, কিন্তু মণিদা'র এখনো দেখা নেই। কোথায় গেছে কাউকেই কিছু বলেনি। মনে মনে ভাবলাম, বোধ হয় কাবেরীর কাছেই গেছে। কিন্তু অত সকালে আবার কাবেরীর কাছে কেন ?

চান করে, খেয়ে ঘর থেকে বেরোতেই দেখি দরজার পাশে একটা dishএ করে খানিকটা এলাচ আর লবঙ্গ নিয়ে লতা দাঁড়িয়ে। বললাম,—"আজ কিন্তু শুধু এলাচেই পার পাবে না। আজ যে রবিবার—জানো তো, যারা সপ্তাহের ছ'টা দিন কাজে ব্যস্ত থাকে রবিবারটা তাদের জন্যেই। সুতরাং আজকের midday programme-টা স্মরণ করিয়ে দিলাম।"

লতার ঠোঁটের কোণে একটা চাপা লজ্জার হাসি খেলে গেল। চোখটা একবার আমাব দিকে তুলেই নাবিয়ে নিলে।

হঠাৎ লতার চোখের দিকে চেয়েই বলে উঠলাম, "আরে দেখি, দেখি, চোখটা বোজ তো, চোখের পাতায় কি একটা লেগে রয়েছে।" লতা চোখটা বুজতেই তাকে কাছে টেনে নিলাম। ঠিক এমন সময়—

বারান্দায় আমার এক পিসীকে দেখা গেল। একটা ঘটি করে গোবর-জল ছড়াতে ছড়াতে তিনি আমাদেব দিকেই আসছেন!

লতাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে বললাম—"ওঃ কিছু নয় চোখের একটা ছেঁড়া পাতা।"

লতা আড়চোখে একবার পিসীকে দেখে নিয়ে মুচ্‌কি হেসে বললে,—"তা আমি জানতাম"—তারপর—তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে সে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল—আর আমি বোকার মতো সিঁড়ির দিকে পা' বাড়িয়ে দিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছি ঠিক এমন সময় দেখা দিলেন।

মণিদা'। খালি পা, চুলগুলো উস্কো-খুস্কো—মালকোঁচা মেরে কাপড় পরা, কোমরে বাঁধা একটা তোয়ালে। আমাকে দেখেই হাসতে হাসতে বলল,—"চিত্রগুপ্তের খাতায় আর একটা নাম উঠ্‌লো রে।"

বললাম,—"তার মানে? কোথায় গেছ্‌লে তুমি?"

—"বোকা ছেলে! বুঝতে পার্‌লি না? শ্মশানে রে, শ্মশানে! সে বিষ খেয়েছিল। প্রথমতঃ পুড়ে গিয়ে তাকে এমন কদাকার দেখতে হয়ে গিয়েছিল যে মনে করেছিল যে আমার কাছে বা তার স্বামীর কাছে আর কোন দামই বুঝি তার নেই এবং দ্বিতীয়ত—She was big……and that was my fault. রবি তা জানতে পেরে গেছ্‌ল।"

চম্‌কে উঠলাম।—"সে কি! কাবেরী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে!"

—"হ্যাঁ, আত্মহত্যাই করেছে।" পকেট থেকে দু'টো লজেন্স্‌ বার করে আমার হাতে দিয়ে গান গাইতে গাইতে মণিদা' সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো—

"চল আজ দুজনায়
সেই রেখার মাঝে মিশে যাই।
সীমান্তের গান গাই।
সবুজ নীলেতে ওই মেশা
এসো আজ—।" সিঁড়ির বাঁকে মণিদার দেহটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

ক্রস্ কানেক্শান

"হ্যালো, হ্যালো হ্যাঁ কে অমিতা ?"

ওপাশ থেকে স্বর ভেসে এল "হ্যাঁ আমি, তোমার খবর কি ? কবে ফির্লে ?"

"আজকেই, তোমাদের বাড়ী কাল যাব।"

হঠাৎ আর একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সেটা আর একজন পুরুষের "আমার বাড়ী ফির্তে দেরী হবে।"

ওদিক থেকে আর একটা স্ত্রীলোকের স্বর শোনা গেল। সেটা অমিতার নয়। "কেন ? এদিকে তোমার জন্যে যে রমেশ অপেক্ষা ক'র্ছে।"

বুঝলাম ক্রস্ কানেকশান্ হয়েছে। বল্লাম "অমিতা, ক্রস কানেক্শান্।"

অমিতা ব'ল্লে "বুঝেছি।"

হঠাৎ ওদিকের ভদ্রলোকটি চীৎকার ক'রে উঠ্লেন "বুঝেছেন তা হয়েছেন কি ? ছেড়ে দিন্না। আমরা কথা বল্ছি দেখ্তে পাচ্ছেন না ?"

এবার আমি ব'ললাম "দেখ্তে আর পাচ্ছি কই ? অবশ্য শুনতে পাচ্ছি। তবে আমরাও কথা বল্ছি আপনিও নিশ্চয়ই শুন্তে পাচ্ছেন।"

"তার মানে ? আপনি লাইন কাট্বেন না ?"

"আপনিও ত' ইচ্ছে করলেই কাট্তে পারেন।"

ওপাশের ঐ ভদ্রলোকটির লাইনের মেয়েটি এবার কথা ব'ললেন, "আচ্ছা, ঝগড়া ক'রে কি হবে? তুমিই বাপু লাইনটা ছেড়ে দাও না।"

"না—না, কক্ষনও নয়। টেলিফোন ছাড়বে না—ব'ললেই নয়? এমন মুখ খিস্তি ক'রবো, যে ছাড়তে বাধ্য হবে।" ভদ্রলোক একেবারে ক্ষেপে গেছেন।

আমি একটু জোরে হাস্য সহ ব'ললাম "আপনার লাইনের ভদ্রমহিলার কানে আপনার খিস্তি যাওয়া সত্ত্বেও, আপনি যদি তা ক'রতে পারেন, তা হলে শুনে রাখুন আমিও করতে পারি। কারণ—আমার লাইনের মেয়েটিও আমার প্রণয়িণী। সুতরাং আমারও কিছু বাধবে না। তার চেয়ে বরং ঝগড়া, খিস্তি না ক'রে, আসুন আমার প্রণয়িণীর একটা গান শোনা যাক, আর ওর গলাটাও বেশ মিষ্টি।" ওপাশ থেকে অমিতার এক টুক্‌রো হাসি ভেসে এলো।

"নন্‌সেন্স, ফাজিল ছোক্‌রা কোথাকার। ড্যাম ফুল, তোমার ঠিকানা বলো, তোমার নাম বলো, উল্লুক কোথাকার আমি তোমার নামে কেস ক'রবো।"

বুঝা গেল ভদ্রলোকটির ব্লাডপ্রেসার আছে। কিন্তু তবুও, এবার আমারও মেজাজ গেল খারাপ হ'য়ে, আমিও বললাম "ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বল্‌তে জানেন? মনে রাখবেন, আমিও রায় বাহাদুর···মুখোপাধ্যায়ের নাতি। কেস করতে আমিও জানি।"

হঠাৎ যেন আগুনে পোড়ান লাল লোহায় জল পড়ল।

ওদিকের ভদ্রলোকটি একটি আর্ত্তনাদ করে উঠ্লেন—“এ্যঁা—কে সোনা।”

আমিও চম্‌কে উঠলাম, সর্ব্বনাশ, আমায় চেনে দেখছি।—“কে, কে আপনি?”

“আমি যে তোর দাত্ব।”

তখন আমার গলার স্বরটা প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে এসেছে, বললাম—“এ্যঁা সে কি দাত্ব আপনি? না—না, আমার নাম ত সোনা নয়।” আঃ, যা হ'ক: একটা নামও ছাই মনে পড়ছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ, “আমার নাম অতুল বন্দ্যোপাধ্যায়।”

অনেক যেন ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছেন, এমন গলায় তিনি ব'ললেন—“হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই-ই ত', তোমার নাম কি সোনা হতে পারে? তোমার নাম ত অতুল।”

অধরা

নাম তার ছবি। দেখেছো তাকে? হয়তো দেখেও থাক্‌বে। সেই সুন্দর মেয়েটি কে জানো? আমার অভিমানিনী প্রিয়া। প্রায় একবছর ধরে আমার মন নিয়েছে সে। তাকে আমি ভালোবেসেছি। তার সংগে দেখা হয় আমার রোজই। শুধু নীরবে চেয়ে থেকে দেখি, তার সুন্দর অম্লান ছোট্ট কপালটিকে; আর দেখি তার সুন্দর ঠোঁট দু'খানি একটু কাঁপছে কি না। জানিনা সেও আমাকে দেখে কি না, তবে তার চোখও চেয়ে থাকে আমার দিকেই। হয়তো আমার দিকে সে শুধু চেয়েই থাকে, ভাবে বোধহয় অন্য কোন কথা। ছবিকে আমি সত্যই ভালোবাসি। আমার মনের চোর-কুঠুরীতে শুধুই সে একেলা, প্রতিদ্বন্দ্বী নেই কোনও। প্রায়ই কথা বলি তার সংগে, কিন্তু উত্তর পাই না কিছুই। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়—শুধু কি আমিই ভালোবাসি একা, সে কি নয়? জানি না মেঘাবরণের উপরকার নির্ম্মল আকাশের মতো, তার অসীম মনে আমার জন্যে একটি ছোট্ট তারাও কি জেগে নেই? হয়তো আছে। দিনের প্রকাশকারী আলোয় মোলায়েম মেঘের আস্তরণের তলায় হয়তো ম্লান হয়ে গেছে তার ক্ষীণ ইসারা।

একদিন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো আমার মন। দিন কি ফুরাবে না? রাত্রি কি আসবে না? দিনের আলো-ঢাকা

ইসারা রাত্রে আমায় ডাকবে না কি কোন দিনই? মনের মধ্যে অধৈর্য্যের উত্তেজনা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। রাত্রের আকাশ থেকে তখন তমিস্রা ঝর্‌ছে। নিস্তব্ধ রাত্রের বাতাসে বাতাসে তখন ভেসে বেড়াচ্ছে ঝিম্ ঝিম্ স্তব্ধতার গান। আজকেই সেই রাত্রি। আজই আমায় জানতে হবে—সে আমায় ভালোবাসে কি না। তার চোখের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। অত রাত্রে আমাকে দেখে সে ভয় পেলো না, সরেও গেল না একটুও—বা মুখও ঘুরিয়ে নিল না অন্য দিকে। শুধু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো। তাকে স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করলাম,—সে আমায় ভালোবাসে? ঠোঁট তার কাঁপলো না একটুও। গলা দিয়ে শব্দও বেরোল না কিছু, শুধু চোখের দৃষ্টি আরো স্পষ্ট হ'ল। উত্তর আমি পেয়ে গেলাম।

পরের দিন সকালে উঠেই মনে পড়ল আমার বৌ-এর কথা। কাল সকালে সে ছিল আমার শুধু প্রিয়া, আজ সকালে সে আমার প্রিয়াও আর স্ত্রীও। কাল রাত্রে অন্ধকারকে সাক্ষী করে আর স্তব্ধতার ঝিম্ ঝিম্ মন্ত্রে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। আজ প্রাতে আমি বিবাহিত। তার কাছে গেলাম, তার দিকে চাইলাম। আজ তার দৃষ্টি কতো সরল, কতো সোজা। কোন কিছুই গোপনতা নেই সেখানে। তার দৃষ্টি যেন আমায় বলে দিচ্ছে—যে তার সব কিছুই আমার কাছে প্রকাশ্য, বুঝিয়ে দিচ্ছে যেন সে আমার কাছে একটা বিরাট উদার প্রান্তর। যতদূর দৃষ্টি যায় সবই ফাঁকা,

কোথাও একটি গাছেরও বাধা নেই। সেই অবাধ নিঃসীমের মধ্যে দৃষ্টি যেন দিশেহারা। প্রান্তরের সবটাই আমার। আমি যেখানে খুশী ছুটে যাবো, যেখানে খুশী শুয়ে পড়ব, যেখান থেকে খুশী দু'মুঠো মাটি তুলে আনবো। কেউ বাধা দেবে না, কেউ দাবীও জানাবে না। সবটাই যে আমার। কোথাও গাছ পুঁতবো না, ঢাকাও দেবো না কোথাও। যেখানকার মাটি উত্তপ্ত হয়ে যাবে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবো, আমার ছায়া দিয়ে শীতল করবো তার উত্তপ্ত মাটিকে। শীতের বরফ-ঝরা রাত্রে যখন হিম হয়ে যাবে তার দেহ, আমার উষ্ণ নিঃশ্বাস আর উত্তপ্ত দেহ তখন আরাম দেবে তার শীতল বক্ষটিকে।

আজ ২রা জানুয়ারী। সন্ধ্যাবেলা আবার তার কাছে গেলাম। চম্‌কে উঠলাম, সে নেই। কোথায় গেছে, কেন গেছে? কোন ঠিকানা রেখে যায় নি? কতো সন্ধান নিলাম, কতো জনাকে জিজ্ঞাসা করলাম। কেউই জানে না তার ঠিকানা। মনে মনে ভাবলাম,—'অভিমান? রাগ? দুঃখ?' নতুন বছরের উপর বিষিয়ে উঠলো আমার মন। সে-ই আমার প্রিয়াকে ঘর ছাড়া করেছে আজ। কোনদিনই সে আর ফিরবে না বোধহয়। কিন্তু—যাক্ না! তার আর প্রয়োজন কী? আমার প্রয়োজন তো মিটেছে। সে আমায় ভালোবেসেছিল, আমিও তাকে ভালবাসি। আর তো কোন প্রয়োজন নেই। বিয়ে? ওটা কিছু না। সে যাক; আর তাকে খুঁজবো না। · এবার বলি—জানো সে

কে? কোন এক নাম-না-জানা শিল্পীর তুলির মুখে তার জন্ম। আমার ঘরে টাঙানো একখানি ক্যালেণ্ডারের ছবি। মনে মনে সেই অজ্ঞাত স্রষ্টাকে নমস্কার করলাম।

স্মোক্ রিং

আমার এক বন্ধুর বিবাহে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেছি একটু আগে। একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে আছি। বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে। চেয়ারের হাতলে ঝুল্‌ছে একটা বেলফুলের মালা। একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগছে। সামনের খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের এক টুক্‌রো আলো এসে পায়ের উপর লুটোচ্ছে। জানালার গরাদের ছায়াগুলো লম্বা-ভাবে জানালার তলা থেকে আমার পায়ের উপর এসে পড়েছে। জানালার পাশে টাঙ্গানো লতিকা ও আমার একখানা ষ্টুডিওতে তোলা ছবি। পেছনের বেড-লাইটের ক্ষীণ আলোটা তার উপর এসে পড়েছে। দৃষ্টি সেই দিকেই নিবদ্ধ। মাথার উপর বৈদ্যুতিক পাখার একঘেয়ে হাওয়া কাটার শব্দ। চোখে লাগছে ঘুমের আমেজ। চোখের পাতাগুলো মিলনের আশায় ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ কি হ'ল জানিনা, কোথা থেকে এক টুক্‌রো জোরালো আলো ছবিটার উপর এসে পড়্‌ল। ছবিটা একবার যেন নড়ে উঠ্‌ল।

ভূমিকম্প হচ্ছে না কি?

হঠাৎ ছবির মধ্যকার পুরুষটি যেন কথা ব'লে উঠ্‌ল "লতিকা, বল সেটা কি আমার অন্যায়?"

নিজের চোখ্‌কে বিশ্বাস ক'রতে পারলাম না, সুন্দর চাঁদের আলোয় পা ডুবিয়ে বসে আছি। সারা শরীরে এসে লাগ্‌ছে বৈদ্যুতিক পাখার ঠাণ্ডা হাওয়া, পাশ থেকে ফুলের গন্ধ উঠ্‌ছে। পাশের বাড়ীর মেয়েটার ঘর থেকে ভেসে আস্‌ছে সেতারের অস্পষ্ট টুং টাং শব্দ। এটাও কি সম্ভব, আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি। তবে—তবে কী? ভৌতিক ব্যাপার? ছবিটার দিকে জোরালো ভাবে চাইলাম।

নারী মূর্ত্তি এবার কথা বলল "তুমি অপরাধী।"

নিজের বুকের স্পন্দন শুন্‌তে পেলাম। চারিদিক স্তব্ধ। সেতার থেমে গেছে। সারা বিশ্ব জুড়ে যেন আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ঘামে শরীর ভিজে গেছে। শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নীচের দিকে নামছে। খাটের দিকে একবার চাইলাম পরিষ্কার পরিপাটি বিছানাটি, বেড্‌-লাইটের ক্ষীণ আলোয় লাল্‌চে দেখাচ্ছে। ওটা কি? চম্‌কে উঠলাম। কিছু নয় পাশ বালিস।

"তোমার জীবনে যে সুখের প্রদীপ একদিন জ্বলে উঠেছিল, তাকে কি তুমি নিজে নিবিয়ে দাওনি? বল,' চুপ করে রইলে কেন? বল,' আমিই কি অপরাধী? পরিষ্কার জলে সাঁতার দিতে দিতে তুমি পাঁকে ডুব্‌লে কেন,—সবই কি আমার দোষ?" পুরুষটি কথা বল্‌ছে।

আমার অতীতের প্রতিধ্বনি? আমি কি বেঁচে আছি? এই সুন্দর আলোঝরা রাত্রি এ-সবই কি তবে মিথ্যা? কবে, কোন দিন আমার সব শেষ হয়ে গিয়েছিল? কোন যুগের

শরীর নিয়ে আমি বসে আছি। নূতনের প্রারম্ভে যা ঘটেছিল, জীবনের নূতন আরম্ভে আজ কি তারই পুনরাবৃত্তি? কৈ তা তো নয়, আমার ত সবই মনে আছে। আমার সেই বিয়ের রাত্রি, সেই ফুলের উপর বিছানো লতিকার দেহ। হেসে সে বলেছিল "আমাদের নূতন জীবন আরম্ভ হল'।"

সে জীবন ত' আরম্ভ হয়েছিল আর শেষও হয়ে গেছে, "আমি, সত্যই কি আমি অপরাধী ?"

আমার কথার প্রতি উত্তরের মত ছবির নারী মূর্ত্তিটি বলে উঠ্‌ল, "ভেবে দেখো।"

অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে সব কিছুকে হারিয়ে ফেলেছি। নিজেকেও যেন খুঁজে পাচ্ছি না।

মেয়েটি আবার বল্‌ল, "তুমি কি আমায় অবিশ্বাস কর'নি? আমার মিনতি, আমার অশ্রু, আমার শপথ সব কিছুই কি তুমি উপেক্ষা করনি? তুমি কি আমায় বলনি, আমি অসতী?"

সেই নিদারুণ বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। শিউরে উঠ্‌লাম, হতবাক হয়ে গেলাম। কে যেন হাতুড়ি দিয়ে আমার বুকের পাঁজরাগুলো একটা একটা ক'রে চূর্ণ করতে লাগ্‌ল। পথের একটা কুকুর চীৎকার করে উঠ্‌ল। দূরে বাড়ীটার জানালায় একটা ছায়া নড়্‌ছে। তৃষ্ণায় গলা বুজে আস্‌ছে। সারা শরীর যেন মাদকতায় ভ'রে উঠেছে। একটু নড়ে বসবার মত শক্তিও যেন আর অবশিষ্ট নেই। সব ইন্দ্রিয় আজ আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। আমি আজ আমার কাছে

পরাজিত। সব কিছুই যেন বিকারের ঘোর মনে হচ্ছে। সব কিছুই যেন কুৎসিত হয়ে গেছে। চাঁদের আলো থেকে যেন আগুনের বাষ্প উঠছে। পায়ের উপর গড়িয়ে পড়ছে যেন আগ্নেয়গিরির লাভার স্রোত। ফুলের গন্ধ নাকে এসে লাগছে যেন বহুদিনকার গলিত পচা মড়ার দুর্গন্ধের মত। প্রাণপণে হাতের মুঠো দু'টোকে শক্ত ক'রে ধ'রলাম। চোখ জ্বালা করছে, আগুন লেগেছে। গলায় কে যেন উগ্র বিষ ঢেলে দিয়েছে। সারা শরীর যেন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ওই—ফটোটা ঝুল্‌ছে, কোথা থেকে এক টুক্‌রো আলো এসে পড়েছে। তারা দু'জনে তেমনি করেই বসে আছে। বিভীষিকা—বিভীষিকা, বোধ হয় মৃত্যু আস্‌ছে। আমি কি পাগল হয়ে গেছি। আবার বোধ হয় ওরা কথা কইবে। একটু শক্তি, ভগবান একটু শক্তি দাও, ভেঙ্গে চূর্ণ ক'রে দিই ঐ অভিশপ্ত ছবিটাকে।

"সমাজের চোখে তুমি পতিতা" ছবির ভিতরের পুরুষটা বলে উঠল।

অভিভূতের মত ছবিটার দিকে দৃষ্টি ফেরালাম।

পুরুষটা তখন ব'লে চ'লেছে, "শোন লতিকা, আমাকে নিয়ে সমাজ তৈরী হয়নি। সমাজকে নিয়ে আমি। সমাজ তোমায় নির্দ্দোষ ব'লে মেনে নেয় নি। সমাজের চোখে তুমি পাপী। আমি তোমায় ক্ষমা ক'র্‌লেও, সমাজ তোমায় ক্ষমা করবে না। আমার দাদা যদি···"পুরুষটা থেমে গেল। একটা করুণ কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম।

নারী মূর্ত্তি কাঁদছে। এ কি, কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি? প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেছি না কি? কোথায় আমি? পায়ের তলায় কিছু দেখতে পাচ্ছি না; চারিদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, সারা বিশ্ব যেন কুয়াশায় ঢেকে গেছে। আলো কই, পথ কই? নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌ছে। কোন অতলে তলিয়ে যাচ্ছি। এ কোথায় এলাম? চারিদিকে চিতা জ্বলছে, পচা মড়ার দুর্গন্ধ আস্‌ছে। ও কে? কালো পাহাড়ের মত বীভৎস মূর্ত্তি, চোখ দুটোতে যেন সারা পৃথিবীর চিতা জ্বল্‌ছে। "এসো না, আমার কাছে এসো না, ধর' না আমায়। আমি মরব না আমায় বাঁচতে দাও, বাঁচতে দাও।"

পুরুষটার কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, "আমার দাদা যদি প্রশ্ন করে তোমায়, বিবাহিতা নারী তুমি, সে দিন রাত্রে অবিবাহিত যুবক মোহন, কেন তোমার ঘরে ঢুকেছিল, কেন সে বেরিয়েছিল এক ঘণ্টা পরে! পারবে উত্তর দিতে পারবে তাঁর মুখের উপর? পারবে প্রমাণ করতে তুমি নিষ্পাপ?'

আবার সেই কান্না শোনা গেল। কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অতি করুণ ভাবে, সারা জীবনের সঞ্চিত কান্না উজাড় করে ফেল্‌ছে।

পুরুষ মূর্ত্তি আবার বলতে লাগল, "তিনি নিজে কানে শুনেছেন তুমি বলছিলে—"সব নাও, আমার যা কিছু আছে সব নাও, আমি তোমার জন্যে ডালা সাজিয়ে বসে আছি;

কিন্তু আজ নয়, আর এক দিন।—তারপর একটা আর্ত্তনাদ। আর কিছু শোনা যায় নি। এক ঘণ্টা পরে মোহন ঘর থেকে বেরিয়েছিল। তার মুখের দিকে চেয়ে বিশ্বাস হয় নি সে প্রকৃতিস্থ। তোমার বসনও বিস্রস্ত। দাদা সে দিকে চেয়ে মুখ নামিয়ে নিয়েছিলেন। তুমি আমায় মিনতি ক'রে বিশ্বাস কর্‌তে বলেছিলে, তুমি নিষ্পাপ। আমি ত' অবিশ্বাস ক'রিনি, শুধু বলেছিলাম, সকলে তোমায় তাই বলে মেনে নেয়নি। শেষে তুমি ধ্বংস ক'রলে নিজেকে। জানি, সকলে তোমায় দেখে ঘৃণায় চোখ ফিরাত'। সারা পাড়ায় তোমায় নাম নিয়ে আলোচনা চলত'। তারা সন্দেহ করতো তোমার সতীত্বে —তারা ব'লতো তুমি পতিতা।'

হঠাৎ সেই নারী মূর্ত্তি চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌ল, "না—না সব মিথ্যে, সব মিথ্যে ; আমায় বিশ্বাস করো।"

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। চেয়ে দেখ্‌লাম, ইজি চেয়ারে শুয়ে আছি। হাতলে তেমনি মালাটা ঝুল্‌ছে। সামনে খোলা জানালা দিয়ে ভোরের আলো ঘরে ঢুকেছে। হাত থেকে সিগারেটটা মেঝেয় পড়ে কখন নিভে গেছে। একটু শীত করছে। উঠে পাখাটা বন্ধ করে', দেয়ালে টাঙ্গানো বড় আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক রাত্রেই যেন মুখের চেহারা বদ্‌লে গেছে। আবার একটা সিগারেট ধরালাম। কাল রাত্রের স্বপ্নটা মনের উপর চেপে বসেছে। জানালার পাশে টাঙ্গানো ফটোটার দিকে তাকালাম। মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌ল। সিগারেট জোরে টান দিয়ে, একটা

স্মোক রিং ছুড়ে মারলাম আয়নাটার দিকে। সেটা ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে, আয়নায় প্রতিফলিত আমার প্রতিচ্ছবির মুখের উপর আছড়ে প'ড়ে, ভেঙ্গে-চূরে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আমি স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ইতিমধ্যে

‘ক্যাঁ—এ্যাঁ—চ্’—। বিশ্রী একটা শব্দ করে ঝাঁকানীর সংগে সংগে গাড়ীটা পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল।

গিয়েছিলাম সোনামুখীতে শিকার করতে, ফেরার পথেই রাত্রি নেমেছে। এরকম বিশ্রী ব্রেক্ করায় বেশ খানিকটা বিরক্ত হয়েই শান্তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—“হ’ল কি? সামনে সমুদ্দুর নাকি?”

কোন কথা না বলে শান্তা আঙুল দিয়ে সামনের দিকটা দেখিয়ে দিল।

একটু গিয়েই রাস্তাটা ডানদিকে বাঁক্ ঘুরেছে। ‘হেড্-লাইটের’ তীব্র আলো দুটো সাম্‌নের গাছপালার ওপর স্থির। কুকুরের মতো কি একটা সাম্‌নে দিয়ে ছুটে গেল। দূরে হুক্ হুক্ করে কি যেন ডেকে উঠ্‌লো। গাড়ীটার খুব কাছ থেকেই একটা শেয়াল তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিলে। ঝিঁঝিঁদের একটানা ঝিঁ-ঝিঁ-তে রাত্রি যেন ঝাঁঝ্‌রা হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম। আরে! পথের ওপর ওটা কি?—চট্ করে পাশ থেকে ‘রিপিটিংটা’ তুলে নিলাম। শান্তা তাড়াতাড়ি হাতটা ধরে ফেল্‌লো: “করছো কি? দেখ্‌ছো না ওটা একটা মানুষ!”

—“এ্যাঁ, মানুষ! হ্যাঁ—হ্যাঁ তাইতো। মানুষই তো মনে হচ্ছে, না!” চোখদুটো একবার রগ্‌ড়ে নিলাম।

—"শুধু মানুষ নয়—আবার ভদ্দর মানুষ। জামা কাপড় দেখছো ?"

—"তা নয় তোমার ভদ্দর মানুষই হ'ল। কিন্তু—এতো রাত্রে···এই বনের মধ্যে—কি করি বলো তো ? কোন রকমে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না ? এঃ একেবারে পথের মাঝখানে—।"

—"ছিঃ, চুপ্ করো। Want of humanity. তোমার কাছ থেকে এ ধরণের কথা আশা করিনি। দেখো দেখি লোকটা কি রকম ভাবে পড়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই Seriously Wounded. ওকে এই অবস্থায় বনের মধ্যে ফেলে—Coward !"

—"স্বীকার করলাম। কিন্তু তারপর—?"

—"চল, নীচে নেমে ওকে ভালো করে আগে দেখে আসি।"

—"বেশ চল ; টর্চ্চটাও সংগে নাও।"

—"কেন, টর্চ্চ কী হবে ? মোটরের হেড্‌লাইট্ তো জ্বল্‌ছে।"

—"আঃ বড্ড বাজে বকো। হ্যাঁ, তোমার মোটরের হেড্ লাইট্‌টা একেবারে পূর্ণিমার চাঁদ না ? সমস্ত জংগলটাকে আলোয় ভাসিয়ে দিচ্ছে ! নাও, টর্চ্চ নাও।"

গাড়ী থেকে নেমে দুজনে লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সত্যিই ভদ্রলোক। অন্ততঃ জামা কাপড়ে তাই-ই মনে হয়। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। পেটের কাছে জামা কাপড় আর মাটীর খানিকটা রক্তে কালো হয়ে রয়েছে।

—"উঃ, মাথাটা বড্ড ঘুরছে, আমি বরঞ্চ গাড়ীতে গিয়ে বসি।" শান্তার গলাটা একবার কেঁপে উঠ্লো।

দেহটাকে চিৎ করে দিতেই হঠাৎ একটা বিকট আর্ত্তনাদ করে শান্তা মুখ ঢাক্লো।— ইস্, সত্যি, নাড়ীভুঁড়ীগুলো একেবারে বেরিয়ে এসেছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এ নিশ্চয়ই কোন শূয়োরের চার্জ্জ।

"গৌরবরণ তোমার চরণমূলে
ফল্সা বরণ শাড়িটি ঘেরিবে ভালো ;
বসনপ্রান্ত সীমান্তে বেখো তুলে,
কপোল প্রান্তে সরু পাড় ঘন-কালো।
একগুছি চুল বায়ু উচ্ছ্বাসে কাঁপা—"

—"খুব হয়েছে আর কবিত্ব করতে হবে না। ঘরে এক চাম্‌চেও চিনি নেই ; চা খেতে পার্ছিনে। তার কিছু ব্যবস্থা করবে ?"

ত্রিদীপ থেমে যায়।—"এ্যাঁ, কি বল্লে ?"

—"ভূত কোথাকার ; ঘরে চিনি নেই, চা খাবো কি করে ?"

—"চিনি নেই ? তা আর কি হবে ? চা তো আমিও খাইনি।"

—"তোমার চা না খেলেও চল্তে পারে, কিন্তু আমার চল্‌চে না। যেখান থেকে পারো চিনি এনে দাও।"

—"ঘরে তো বাতাসা আছে। তাই দিয়ে উপস্থিত চালিয়ে নাও না।"

—"বাতাসার চা .আমি খাই না। তা ছাড়া ঘরে তাও নেই।"

—"তা হ'লে আর কি করবে? রীতিকাকে একবার জিজ্ঞাসা করো, তাদের ঘরে যদি কিছু থাকে।"

—"না—না—না, পরের কাছ থেকে আমি কোন জিনিস চাইতে পারবো না।" নীলীর চোখে যেন রশুণের ঝাঁঝ্।

—"তা বেশ তো, চিনি না দিয়েই চা খাও না। চিনি না দিয়ে চা খাওয়াটা কিন্তু খুব ভালো।"

—"চুপ করো; রোজ রোজ এই ধরণের ব্যাপার আর কতদিন সহ্য করবো? এই রকম যার অবস্থা, এক চাম্‌চে চিনি দেবারও যার মুরোদ নেই, সে আমার মতো মেয়েকে বিয়ে করতে গেল কেন?" নীলীর নীল্‌চে চোখটা একবার ত্রিদীপের দিকে জ্বল্ জ্বল্ করে উঠলো।

—"বাঃ, বেশ কথা তো! তা তুমিই বা করলে কেন? আর তোমার বাবা তো সব জেনে-শুনেই বিয়ে দিয়েছিলেন।"

—"সে তো নিশ্চয়ই। তোমার মতো একজন ভিখিরীর সংগে বিয়ে দিয়েছেন বলেই তো এই বাড়ীখানাও তাই দিয়েছেন; আর মাসে মাসে টাকাও পাঠান তাই, যার অর্দ্ধেকটা তুমি লবাব-পুত্তুরের মতো দান করো। এঁঃ, দাতব্য চিকিৎসালয় হয়েছে! ছাই হয়েছে, পুড়িয়ে দাও অমন

ডাক্তারখানা।” ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস টান্‌তে টান্‌তে নীলী ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

—“ছি—ছি, এ তুমি কি বল্‌ছ? কত লোকের আজ এতে কত উপকার হচ্ছে জান? পয়সার অভাবে যারা বিনা চিকিৎসায় মর্‌ছিল, তাদের কথা ভাব?”

—“রেখে দাও তোমার ‘পয়সার অভাব’। নিজে রোজগার করে দান করো, কেউ কিছু বল্‌তে আসবে না। কিন্তু আমার বাবার পয়সা নিয়ে ওসব কাপ্তানী চলবে না—।”

—“দীপুদা’, দীপুদা’ আছো?”

—“ঐ নাও, তোমার সোহাগিনী এসে গেছে। এবার যাও, ওর সংগে খানিকটা প্রেমালাপ করে এসো। উঃ, ওসব আমি সহ্য করতে পারবো না—পারবো না—পারবো না। পূর্ব্ব জন্মে আমি যে কি পাপ করেছিলাম, যার জন্য আজ তোমার মতো—।”

—“আ হা—হা ভুল কর্‌ছ, ভুল কর্‌ছ। তুমি এ জন্মে যে কী পাপ কর্‌ছ, যার জন্য আস্‌ছে জন্মে আর আমার মতো স্বামী পাবে না।”

—“গলায় দড়ি অমন স্বামীর”—নীলী ঘর থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল।

এ ধরণের কথা শোনা ত্রিদীপের প্রায় এক রকম অভ্যাসের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে। তাই আজকাল আর গায়ে লাগে না তেমন। রোজই শুনছে—কেবলই শুনছে।

ত্রিদীপ আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরুল। রীতিকা তার তার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছে।

উনিশ বছরের বিধবা মেয়ে রীতিকা। ভারী মিষ্টি স্বভাব, আর ত্রিদীপকে ভালোও বাসে খুব। কিন্তু আশ্চর্য্য, নীলী যে কেন ওকে সহ্য করতে পারেনা, ত্রিদীপ মাঝে মাঝে ভাবে। সে বোঝে নীলীর ভালোবাসা কিসে, আর রীতিকার ভালোবাসা কোথায়!

[মহাযুদ্ধের হোমাগ্নি সারা পৃথিবী গ্রাস করল। ছড়িয়ে পড়ল প্রতিটী শহরে, প্রতিটী গ্রামের মধ্যে। পৃথিবীর হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে বেড়াতে লাগলো সেই সব ধ্বংসকারী অগ্নি-বীজেরা। আর সেই সংগে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো মহাযুদ্ধ মন্থনের পুঞ্জীভূত বিষ। শহরে গ্রামে সব একাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সারা দেশ ছেয়ে ফুটে উঠলো ডুমো ডুমো বিষের fungus। সোনামুখীও বাদ পড়লো না তা থেকে।······মিলিটারীদের অমানুষিকতা, পাশবিকতা এখানেও একবার হাত ছুঁইয়ে গেল।]

ত্রিদীপ রীতিকার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালো।

—"এই যে দীপুদা', কি হয়েছিল? বৌদি তোমার উপর অত রেগে গিয়েছিল কেন? কিছু বলেছিলে বুঝি?"

—"তোমার বৌদির কথা আর বোলো না, ও তো ঐ রকমই। হ্যাঁ যাক্‌গে,—তোমাদের ঘরে চিনি আছে? একটু আন দেখি।" ত্রিদীপ মাটীর ওপরেই রীতিকার পাশে বসে পড লো।

"—চিনি? হ্যাঁ খানিকটা আছে যেন। আচ্ছা আমি এখুনি আন্‌ছি।" রীতিকা উঠে দাঁড়ালো।

খানিক বাদে একটা ডিসে খানিকটা চিনি নিয়ে সে আবার ফিরে এলো।—"এই নাও, এতে হবে?"

—"যথেষ্ট; আঃ বাঁচালে।" ত্রিদীপ রীতিকার হাত থেকে ডিস্‌টা নিয়ে মাটিতে নামিয়ে রাখলো। "তুমি আজ কেমন আছো? কিছুটা ভালো বোধ হচ্ছে?"

—"কই আর? এখনো তো কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

—"আচ্ছা তুমি এখন যাও, আমি বিকেলের দিকে একবার তোমাদের ওখানে যাবো।"

—"আচ্ছা, আসবে নিশ্চয়।" আঁচলটাকে সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে রীতিকা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

—"কী বিদায় হয়েছে?" নীলী ঘর থেকে বেরিয়ে ত্রিদীপের পাশে এসে দাঁড়ালো। "দেখ, আমি কিন্তু এই শেষবার তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি—ঐ মেয়েটাকে নিয়ে ওসব আর চল্‌বে না। ওর সংগে কানে কানে অত কথাই বা কিসের, আর দিনরাত্তির ওদের বাড়ী যাওয়াই বা কেন? ভেবেছো আমি কিছু বুঝিনা? ফের যদি ঐ ছুঁড়িটা আমাদের বাড়ীতে কোনদিন আসে, তা হ'লে আমি কিন্তু একটা কেলেঙ্কারী করবো। তোমাকে আবার জানিয়ে দিলুম।" চিনির ডিস্‌টাকে তুলে নিয়ে ছুম্ ছুম্ করে বাড়ী কাঁপিয়ে নীলী রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

সেদিন রাত্রে জমিদার বাড়ীতে কি একটা গানবাজনার উৎসব ছিল। নীলীও শুন্‌তে গেছে। বাড়ীতে শুধু ত্রিদীপ একলা। বসে বসে সে একটা Landscape আঁক্‌ছে। তুলিতে সবুজ রং মাখাতে মাখাতে হঠাৎ মুখ তুলেই দেখে দরজায় রীতিকা দাঁড়িয়ে। কাপের জলের মধ্যে তুলিটা ডুবিয়ে ত্রিদীপ জিজ্ঞাসা করল,—"কী ব্যাপার, তুমি গান শুন্‌তে যাওনি ?"

—"নাঃ, শরীরটা ভাল নেই। তা ছাড়া—।" রীতিকা থেমে যায়।

—"তা ছাড়া কি ? বল ?"

—"তা ছাড়া, ওটার অবস্থাও খুব খারাপ।" রীতিকা মুখ নামালো।

…হঠাৎ দুম্ দুম্ করে বন্ধ দরজায় ধাক্কা পড়ল।

—"কে ?" ত্রিদীপ চম্‌কে উঠলো।

—"আমি, দরজা খোল।"

—"রীতি, নীলী এসেছে, তুমি ঠিক আছো ?"

—"হ্যাঁ।" রীতিকা খাট থেকে নেমে পড়ল।

দরজা খুলতে খুলতে ত্রিদীপ জিজ্ঞাসা করল,—"এর মধ্যে চলে এলে যে ?"

—"ভীষণ মাথা ধরেছে।" ঘরের মধ্যে ঢুকেই নীলী চম্‌কে উঠ্‌লো।—"এ কি ? রীতিকা তুমি ? এর মানে কি ?"

নীলী ত্রিদীপের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ পাগলের মতো চীৎকার করে উঠ্‌লো,—"বেরিয়ে যাও, এখুনি, এখুনি দূর হও। জানোয়ার কোথাকার! আমি জান্‌তাম একদিন আমাকে এরকম কিছু একটা দেখ্‌তেই হবে; কিন্তু এতো শীগ্‌গীর ভাবতে পারিনি। আমার বাবার বাড়ীতে তোমার আর স্থান নেই। বেরিয়ে যাও! এখনো দাঁড়িয়ে আছো? বেরোও বল্‌ছি।" ক্রোধোন্মত্তা উত্তেজিত নীলী হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পা থেকে জুতো খুলে ছুঁড়ে মারলো ত্রিদীপের মুখের উপর।

—"বৌদি, বৌদি" আর্ত্তনাদ করে উঠলো রীতিকা।

জ্বলে উঠলো ত্রিদীপ। "স্পর্দ্ধা! বেশ, আমি এখুনি চলে যাচ্ছি, কোনদিনই আর ফিরবো না। কিন্তু মনে রেখো এর প্রায়শ্চিত্ত একদিন তোমাকে করতেই হবে।" ঝড়ের বেগে ত্রিদীপ বেরিয়ে গেল! বাইরের অন্ধকারের মধ্যে শরীরটা একটা পাক খেয়ে যেন কোথায় মিলিয়ে গেল।

—"বৌদি, বৌদি এ তুমি কী করলে? ফিরিয়ে আনো, ফিরিয়ে আনো দীপুদাকে। উনি দেবতা, দেবতা। তোমাদের কাছে লজ্জায় আমি বলতে পারি নি। আমার খারাপ অসুখ হয়েছে, উনি তারই চিকিৎসা করছিলেন। তাঁকে তুমি ভুল বুঝ্‌লে!" রীতিকা নীলীর পা ধরে বসে পড়ল।

বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে ক্রোধোন্মাদিনী নীলীর বুক্‌টা হঠাৎ একবার ধ্বক্‌ করে উঠ্‌লো।

ডাঃ ত্রিদীপ বসু এম্-এস্-সি, এম্-বি দরজায় ঝোলানো ঝাপ্সা 'টাইটেল' বোর্ডটা স্পষ্ট হয়ে উঠ্লো। একটা একতলা কোঠাবাড়ীর দরজায় এসে 'সিডান-বডি'টা দাঁড়িয়ে গেল। দরজার কড়াটায় হাত দিতে আমার বুকটা একবার কেঁপে উঠ্লো। (ঠিকানাটা মৃতব্যক্তির পকেট থেকেই পাওয়া গিয়েছিল।) কিন্তু তবু উপায় নেই; সাড়া পেতেই হবে। মনে জোর এনে কড়াটা একবার নাড়িয়ে দিলাম। পিছন ফিরে চেয়ে দেখি হতভাগ্য ডাক্তারের মাথাটা গাড়ীর খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে খানিকটা ঝুলে পড়েছে।

—একটু পরেই বাড়ীর দরজা খুলে গেল।

এর পরে আরও মিনিট দশেক সেখানে ছিলাম। হাতে একফোঁটা জল পড়তেই চম্কে উঠলাম। শান্তার চোখও বাধা মানেনি। ডাক্তারের রক্তাক্ত দেহটার পায়ের কাছে একটি বিধবা; তার শুকনো খট্খটে চোখতুটো যেন দৃষ্টিহীন। মাথার কাছে একটি সীমন্তিনীর শিঁথিরেখা যেন অগ্নিশিখার মতো জ্বল্ছে।

জল-তরঙ্গ

এর আগে কখনও সমুদ্র দেখিনি। 'ওয়াল্‌টেয়ারে' বেড়াতে এসেছি। রাত্রি সাড়ে চারটার সময় উঠে সমুদ্রের বালুবেলার উপর ব'সে আছি। পাশে খোলা র'য়েছে, রবীন্দ্রনাথের "সিন্ধুপারে" কবিতাটা। ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত গায়ের উপর ধাক্কা খাচ্ছে। পায়ের নীচে সমুদ্রের গর্জ্জন। বিশাল তরঙ্গগুলোর মাথায় মাথায়, নেচে বেড়াচ্ছে চাঁদের আলো। ঢেউগুলো আসছে যেন, হীরের পাহাড় থেকে ধ্ব'সে পড়া, চূর্ণিত হীরের স্তূপ। প্রবল বেগে ধ্বংস-মূর্ত্তিতে, ছুটে এসে, তটের উপর আছ্‌ড়ে প'ড়্‌ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে, বালির ওপর একখানা রূপার চাদর বিছিয়ে দিয়ে, আবার চাঁদ ধ'রবার চেষ্টা ক'রছে। মনে হ'চ্ছে তার ওপর যেন সহস্র সহস্র মণি, মুক্তো, হীরের কুচি ছড়ানো। চাঁদকে যেন লোভ দেখাচ্ছে। কিন্তু বারে বারে ব্যর্থ হ'য়েও, সে বুঝ্‌ছে না যে, যা'কে সে ধ'রতে চায়, তারই প্রতিবিম্ব, তাকেই দেখিয়ে, সে তাকে ধ'রবার চেষ্টা ক'রছে। মাথার ওপর অনন্ত, প্রশান্ত আকাশ সমুদ্রের এই পাগ্‌লামী দেখে হাস্‌ছে। শুধু সে জানে, চাঁদ ত' তারই বুকে।

ব'সে ব'সে সমুদ্রের এই পাগলামী দেখ্‌ছি, আর ঢেউয়ের প্রলাপধ্বনি কানে আস্‌ছে। মন ক্রমেই কল্পনা-বিলাসী হয়ে উঠ্‌ছে, গায়ে লাগ্‌ছে ঘুমের প্রলেপ মেশানো ঠাণ্ডা হাওয়া।

বুঝ্‌তে পার্‌ছি অক্টোপাশের মতো নিদ্রাদেবী আমাকে তার বুকের মধ্যে টেনে নেবার চেষ্টা করছে। মনও যুদ্ধ আরম্ভ করেছে ছাড়া পাওয়ার জন্যে। আর মনকে ধরে রাখ্‌তে পারলাম না। ঢেউয়ের মাথায় চড়িয়ে দিলাম। সমুদ্রের ওপর দিয়ে জ্যোৎস্না রাত্রে ঢেউয়ের মাথায় নাচ্‌তে নাচ্‌তে আমার মন অভিসারে চল্‌ল। মনকে নিয়েই আমি—তাই আমাকেও চল্‌তে হ'ল মনের সংগে। এ এক নতুন অভিযান, তরঙ্গেব মাথায় উঠ্‌ছি আর তরঙ্গ থেকে তরঙ্গে লাফিয়ে চলেছি। মাথার উপর জ্যোৎস্না ঝর্‌ছে। এম্‌নি করে উঠে-নেমে, দোলা খেতে খেতে চল্‌তে লাগলাম সাগরের ওপর দিয়ে।

কতদূর চলে এসেছি জানি না। হঠাৎ দেখ্‌লাম ঢেউয়ের শেষ হয়েছে, শুধু স্রোতের টানে ভেসে চলেছি। আরো কিছুদূর গিয়ে থেমে গেলাম। এতটুকু চাঞ্চল্য নেই সেখানে। শান্ত নীল জলের ওপর উঠে দাঁড়ালাম। মাথার ওপরে, উদার আকাশের বুকে তারাদের জলসাঘর। জ্যোৎস্না তেম্‌নি ঝর্‌ছে। শুধু কানে আস্‌ছে হাওয়ার একঘেয়ে গোঙানি। সাগরের বুকের ওপর আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, আমার চারিদিক ঘিরে রয়েছে অতল অনন্ত সমুদ্র, মাথার ওপরে অসীম আকাশ। এক একটা হাওয়ার ঝাপ্‌টা আস্‌ছে, মনে হচ্ছে এখনই উল্টে দেবে।

হঠাৎ মনে হ'ল পায়ের তলা থেকে যেন জল সরে যাচ্ছে। বুঝ্‌তে পারলাম আমি সমুদ্রের নীচে তলিয়ে যাচ্ছি। একবার

প্রাণপণে ছু'হাত দিয়ে বাতাস আর জ্যোৎস্নাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলাম। মাথার ওপর থেকে আলো বাতাস সব ঢেকে গেল।

অন্ধকার, গভীর অন্ধকার! নেমে চলেছি পাতালের গহ্বরে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে না, কোন অস্বস্তিও হচ্ছে না; শুধু অন্ধকার চারিদিক থেকে যেন চেপে ধরেছে। নাম্‌তে নাম্‌তে কখন এক জায়গায় থেমে গেলাম। হঠাৎ সেই অন্ধকারের মধ্যে কোথা থেকে চারিদিক আলোয় ভরে উঠ্‌লো। দেখলাম, আমি একটা সুন্দর বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি; চারিদিকে অজস্র নানা রঙের ফুল, লতাপাতা; তাদের ভেতর দিয়ে লাল নীল কত রঙের মাছ খেলা কর্‌ছে। চারিদিকে যেন রঙের মেলা বসে গেছে। সাম্‌নে চেয়ে দেখলাম একটা বিরাট বন্ধ স্বর্ণদ্বার ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এ কোথায়—কোথায় এলাম! এ কোন রূপকথার রাজ্য!

দরজা সম্পূর্ণ খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কোন এক মন্ত্রবলে সমস্ত জল সেখান থেকে সরে গেল। দেখলাম এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। বিরাট প্রশস্ত একটি দালান। তার ভিতরে শত শত ঝাড়লণ্ঠন ঝুল্‌ছে। তাদের আলোর দিকে চাইলে চোখ ঝল্‌সে যায়। দরজার মুখ থেকে বরাবর ভিতরে চলে গেছে ফুল ছড়ানো একটা মখ্‌মলের রাস্তা। তার ছুই ধারে দাঁড়িয়ে আছে শত শত রূপসীর দল। সকলের পরণেই ফিকে নীলরঙের শাড়ী।

মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলি জানুদেশ স্পর্শ করছে। মাথায় শাঁখের মুকুট, বুকে ঝুল্‌ছে নীলার মালা, হাতে পলার চুড়ি, কোমরে ঝিনুকের মেখলা। আঁচলের প্রান্তভাগ মাটিতে লুটাচ্ছে। সকলেরই বাম হাতে শঙ্খ ও ডান হাতে একটি করে চামর। ঝাড়ের আলোয় তাদের চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রঙ্‌ যেন ফুটে বেরোচ্ছে। দু'দিকের গালে গোলাপী রঙের আভা। চোখের দৃষ্টি আবেশ মাখানো আবেগে ভরা। আধ ঘুমঘোর তন্দ্রা মাখানো। চাইলে মন মাতাল হয়ে যায়, সুরার নেশা লাগে। মনে হচ্ছে সেই পাথরের মতো স্থির ধীর মূর্ত্তিগুলি যেন আমারই জন্য অপেক্ষা করছিল।

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি; নিজের অস্তিত্বও বিস্মৃত হয়েছি। এ কোন স্বপ্নলোক!

হঠাৎ তাদের মধ্য থেকে একটি সুন্দরী তার শঙ্খ ও চামর মাটিতে নামিয়ে রেখে আমার দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। তার প্রতিটি পদক্ষেপে যেন মৃত্যুর ভঙ্গী ঝরে পড়্‌ছে। সুন্দরীর পাৎলা মোলায়েম কাপড়ের তলাকার সুন্দর উরু দুখানির ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে কাপড়ের ওপর। নাভির একটু তলা থেকে একটা সরু খাঁজ বরাবর হাঁটু পর্য্যন্ত নেমে এসে উরুর ইশারাটাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। চলার তালে নূপুর বেজে উঠ্‌লো। মখ্‌মলের উপর দিয়ে নূপুরের ধ্বনি তুলে রূপসী আমার সামনে এসে থাম্‌লো। তার দেহ থেকে সুন্দর চন্দনের সুরভি বেরোচ্ছে। দু'টি কর্ণমূলে দুল্‌ছে বড় বড় দুটি মুক্তা। মুখে স্মিত হাসি।

বুকের কাপড় খানিকটা সরে গেছে, পাৎলা জামার ভেতর দিয়ে সুপুষ্ট উন্নত স্তনযুগল পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে চাইলাম। বুকের স্পন্দন দ্রুততর হ'লো। শিরায় শিরায় রক্তের চাঞ্চল্য। শরীর কাঁপতে লাগল।

ঘন দীর্ঘ কালো ভ্রূযুগল কেউ যেন তুলি দিয়ে এঁকে দিয়েছে। তার তলায় দীর্ঘ পল্লবযুক্ত সুন্দর অবর্ণনীয় দু'টি আয়ত চক্ষু। আমার পায়ের তলা থেকে বুকের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে চোখ তুলে আমার দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলালো। আমি অভিভূত, আমি বিহ্বল।

রূপসী তার চাঁপাফুলের মতো আঙ্গুলগুলি দিয়ে আমার বাঁ হাত ধরে ঈষৎ আকর্ষণ কর্‌লো। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকে অনুসরণ কর্‌লাম। সংগে সংগে সেই রূপসীর দল শঙ্খে ফুৎকার দিল। সেই নীরব স্তব্ধ পুরী শঙ্খধ্বনিতে জেগে উঠ্‌লো।

ফুল ছড়ানো মখ্‌মলের নরম পথে পা ফেলে আমি আমার সঙ্গিনীর সংগে এগিয়ে চল্‌লাম। পেছনে চামর দোলাতে দোলাতে সুন্দরীর দল আমাদের অনুসরণ করতে লাগ্‌লো। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে অগুরুচন্দনের গন্ধ, স্তব্ধ পুরীতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ছে শত শত নূপুরের ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দ। কল্পলোকের মায়াপুরীতে রূপসীদের সংগে আমি অভিসারে চ'ললাম। পথের দু'ধারে সারি সারি স্ফটিকের স্তম্ভ। মাথার

উপরে নানা বর্ণের পাথরের তৈয়ারী ছাদ্, তার উপর থেকে ঝাড়গুলি ঝুল্ছে। পাশের দেয়ালগুলি প্রবালের। দেয়াল-গুলির গায়ে চিত্রে বিচিত্রিত নানা রঙের ঝিনুকের কাজ। স্তম্ভগুলির গায়ে একটি করে রঙীন মৎস্যচিত্র অঙ্কিত।

আমার রূপসী সঙ্গিনীর হাত ধরে আমি চলেছি। কিছুদূর গিয়ে সম্মুখে একটি উঠান পড়্ল। উঠানের মাঝখানে একটা ফোয়ারা। সেটা থেকে অনর্গল গোলাপজল ঝর্ছে। তার চারিধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে কতকগুলি পেখমতোলা ময়ূর। তাদের পাশ কাটিয়ে আরো ভিতরে চ'ললাম। এবার সাম্নে পড়্ল একটি বিরাট চৌবাচ্চা। তার স্বচ্ছ জলের মধ্যে খেলা করছে নানা রঙের ছোট ছোট মাছ। আর সেই চৌবাচ্চার ধারে ধারে বসে রয়েছে উলঙ্গবক্ষ নামমাত্র কটিবাস পরিহিতা আরো রূপসীরা। তাদের কলহাস্যে স্থানটি মুখরিত। কারুকার্য্যখচিত বিরাট স্তম্ভগুলি বহু উর্দ্ধে উঠে গেছে। নীল আব্ছা আলোয় স্থানটি স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখানেও থামলাম না। সুন্দরী আমার হাত ধরে নিয়ে চল্লো আরো ভেতরে। কোথায় চলেছি, কোথায় যেতে হবে, কিছুই বুঝ্ছি না। তবু চলেছি, থামবার যেন ক্ষমতা নেই। পেছনে তেমনি চামর হাতে নীরবে অনুসরণ কর্ছে সেই সব রূপসীরা। তাদের ঘুঙুরের ধ্বনি দেয়ালের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠ্ছে।

এইবার আমাদের থামতে হ'ল। সাম্নে একটা দরজা। তাতে লম্বা লম্বা ছড়ায় ঝুল্ছে মুক্তার পর্দ্দা। ভেতর থেকে

ভেসে আসছে মৃদু মধুর জলতরঙ্গের বাজনা, নাকে লাগ্‌ছে গোলাপী আতরের গন্ধ। ভেতর থেকে পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে উজ্জ্বল ঝাড়ের আলো।

এ কোথায়! এ কার কাছে! সব শেষের খেলা কি এই ঘরেই সুরু হবে? আমার সঙ্গিনীর ইঙ্গিতে মুক্তার পর্দ্দা সরিয়ে আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

বিশাল বিরাট আয়তনের ঘর। ঝাড়ের আলোয় সবকিছুই দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেখানেও বিরাট বিরাট স্তম্ভগুলি ছাদ স্পর্শ করেছে। মেঝের উপর চক্রাকারে নতমুখে বসে আছে নীলবসনা সুন্দরীর দল। তাদের এলায়িত কেশের মাঝে মাঝে গোঁজা রয়েছে নানা রঙের ঝিনুক। মাঝখানে স্বপ্নের মতো বসে আছে একটি ফিকে গোলাপী রঙের বসন পরিহিতা অপূর্ব্ব সুন্দরী, হাতে একটা সোনার মুকুট। মাথার উপরে চুলগুলি চূড়া করে বাঁধা, নর্ত্তকীর বেশ। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো। অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী, দেহ থেকে সৌন্দর্য্য যেন উপ্‌ছে পড়ছে। অজন্তার গুহা অংকিত ছবি মনে পড়ে গেল। সেই মদালস স্বপ্নাতুর চোখ আরো গভীর, সুরায় ডোবানো চাহনী। সেই হাসি আরো সুন্দর। প্রতিটি অবয়বে কোথাও যেন তিল পরিমাণ সৌন্দর্য্যের অভাব নেই। অতি ধীরে মৃদু চরণে সেই সৌন্দর্য্যের রাণী আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। সমস্ত দেহমন মাদকতায় ভ'রে উঠ্‌লো। ঘরের সব কিছু যেন দুল্‌তে লাগ্‌লো। হাত পা শিথিল হয়ে আস্‌ছে, যেন আর

দাঁড়াতে পারছি না। এ কোথায়, কোথায় আমি! একি স্বর্গরাজ্য! কোন ইন্দ্রপুরীর মহলে আমি চলে এসেছি!

সেই শ্রেষ্ঠা সুন্দরী তার হাতের মুকুটখানি আমায় পরিয়ে দিল। তার বক্ষের মৃদু স্পর্শ অনুভব করলাম। সুন্দরী আমার হাত ধরে অল্প দূরে অবস্থিত একটি মণিমুক্তাখচিত মকরমূর্ত্তি পালঙ্কের উপর বসিয়ে দিল। সংগে সংগে ঘর ভ'রে উঠ্‌লো সেতারের ঝঙ্কারে।

হঠাৎ ভয়চকিতা হরিণীর মতো চম্‌কে উঠে সেই সুন্দরী ছুটে গিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালো। নৃত্য আরম্ভ হ'লো। জলতরঙ্গ বেজে উঠ্‌লো সেতারের ঝঙ্কারের সাথে সাথে। কখনো বেতসপত্রের মতো তনুলতাটি কাঁপিয়ে, কখনো ঘুরে নূপুরের তালে তালে সুন্দরী নাচ্‌তে লাগ্‌লো। আমার ছু'দিকে ছু'টি রূপসী তরুণী। পিছন থেকে কয়েকজন তরুণী গোলাপজলের ঝারি থেকে গোলাপজল ছিটোচ্ছে। সম্মুখের চক্রাকারে উপবিষ্টা সুন্দরীরা শুধু তাদের হাত ছু'টি দিয়ে একসাথে নৃত্যের ভঙ্গী দেখাচ্ছে। কখনো সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে পড়ে, কখনো ছু'টি হাত উপরে তুলে কাঁপাতে কাঁপাতে নীচে নামাচ্ছে।

আমি সম্রাট, আমি ইন্দ্র। আমার সম্মুখে শত শত রূপসী নাচ্‌ছে। পৃথিবীর রূপ ভুলে গেছি। চীৎকার করে উঠ্‌লাম। "নাচো নাচো; কোথায় সুরা।" একটি রূপসী উঠে এসে শাঁখের মধ্যে সুরা ঢেলে আমার হাতে দিল। এক নিঃশ্বাসে পান করে ফেল্‌লাম। "আরো, আরো চাই।"

পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষ করে চলেছি ; হাত পা অবশ হয়ে আসছে। মাথাটা ভারী হয়ে উঠ্‌লো—কান দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে। পালঙ্কের উপর এলিয়ে পড়্‌লাম। সাগরের নীচে জলসাঘরে তখনো নাচ চল্‌ছে।

হঠাৎ সেই রূপসী নাচ্‌তে নাচ্‌তে তার বহির্বাস খুলে ফেল্‌লো। চম্‌কে শিউরে উঠ্‌লাম। রূপসী নাচ্‌ছে শুধু ঘাগ্‌রা পরে। স্তনযুগল ধ'রে আছে শুধু এক ফালি রেশমের টুক্‌রা। তার সূচ্যগ্র সম্মুখভাগ যেন রেশমের টুক্‌রো ফুঁড়ে বেরুতে চায়। নাচের তালে তালে তারাও নেচে উঠ্‌ছে। রূপসী লাটিমের মতো ঘুবতে ঘুবতে নাচ্‌তে লাগ্‌লো। তার ঘোরার বেগে ঘাগ্‌বা উপরের দিকে উঠ্‌ছে পায়ের সুডৌল গোছ থেকে জানুর উপবে উঠ্‌লো, তারপর উরু। রূপসী তখনো ঘুরে চলেছে। তারপর আরো—আরো—আরো—। নিজের বক্ষস্পন্দন শুন্‌তে পেলাম। ছ'হাত দিয়ে বুক চেপে ধরলাম। দেহের রক্ত উত্তেজনায় ফুট্‌তে লাগ্‌লো। নাচ্‌তে নাচ্‌তে সুন্দরী তার বক্ষাবরণও খুলে ফেললো। উন্নত শুভ্র ছুধের মতো স্তনদ্বয় যেন বক্ষ ভেদ ক'রে উঠেছে। নাচের তালে তালে তারাও নাচ্‌ছে। শরীরে আগুনের উত্তাপ অনুভব কর্‌লাম। পার্শ্বস্থিতা একটি তরুণীর বুকের উপর আমার হাত চেপে ধরলাম। মৃছ হেসে হাতটা সে সরিয়ে দিল। আমি পাগল হয়ে উঠেছি ; টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়ালাম। নৃত্যরতা রূপসীটি তার ঘাগ্‌রা খুলে ফেল্‌লো। সংগে সংগে ঘরের

সব কটি আলো নিভে গেলো। শুধু ফিকে নীল রঙের আবছা আলোয় ঘরটা ভরে উঠ্‌লো। সেই ক্ষীণমধ্যা স্বপ্নসুন্দরী ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সম্পূর্ণ নিরাবরণ; নীলচে আবছা আলোয় অস্পষ্ট প্রতিটি অবয়ব দেখা যাচ্ছে। সরু সরু অন্ধকারের রেখাগুলো সুস্পষ্ট। রূপসী আমার পাশে এসে বস্‌লো। দেহের রক্ত ফুট্‌ছে, বুকের মধ্যে হাতুড়ীর ঘা পড়তে লাগ্‌লো। আর পারলাম না, ঝাঁপিয়ে পড়ে তার তনুলতাটি দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম, আমার বুকের উপর তার উলঙ্গ বক্ষ প্রাণপণে চেপে ধরলাম। উষ্ণ নরম মাংসের মধ্যে আঙ্গুলগুলো যেন অর্দ্ধেকটা হারিয়ে গেল। দু'টি হৃদয়ের স্পন্দন একই তালে চল্‌তে লাগ্‌লো। জিভ্‌ আঠার মতো জড়িয়ে গেছে। চোখ ধীরে ধীরে বুজে আস্‌ছে। মুখের কাছে সুন্দরীর স্বপ্নাতুর মদালস চোখ দু'টি স্থির। সেতারের ঝঙ্কার থেমে গেছে; শুধু জলতরঙ্গের টুংটাং শব্দ কানে আস্‌ছে। আমি ধীরে ধীরে সুন্দরীর ঠোঁটের উপর আমার ঠোঁট চেপে ধরলাম।

হঠাৎ অসহ্য যন্ত্রণায় কল্পনার চমক ভাঙ্‌লো। বাস্তব জগতে ফিরে এসে ভাবলাম, কল্পনার হাল্‌কা পাখায় ভর করে কোথায় চলে গিয়েছিলাম। সমুদ্রের জলে কে যেন আবির গুলে দিয়েছে, সূর্য্যোদয় হচ্ছে। পাশে রবীন্দ্রনাথের

"সিন্ধুপারে" কবিতার পাতাগুলো হাওয়ায় ফর্‌ফব্‌ করে উড়ছে। ডান হাতের বুড়ো আঙুলে একটা কাঁক্‌ড়া কামড়ে ধরেছে।

—শেষ—